বিশেষ সংখ্যা

আগস্ট ২০২৩ ■ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩০

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

কেন তিনি আমাদের জাতির পিতা

ফারাহনাজ সিদ্দিকী সিমিন, একাদশ শ্রেণি, স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, শুভেচ্ছা নিও। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ।

তোমরা তো জানো ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে আমাদের প্রিয় নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। সেদিনের পর থেকেই আগস্ট মানেই শোক আর কান্নায় মোড়ানো মাস। ঘাতকরা সেদিন ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলে বা তিনি না থাকলে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু তাদের এই ধারণা আজ ভুল প্রমাণিত। শোক যে শক্তির উৎস হয় আজকের বাংলাদেশ তার প্রমাণ। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ মধ্যমআয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে এখন আমাদের দেশ স্মার্ট বাংলাদেশের পথে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে বঙ্গবন্ধুর ডাক নাম ছিল খোকা। শৈশব-কৈশোর থেকেই তিনি দেশের মানুষকে খুব ভালোবাসতেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন সব মানুষকে নিয়ে ভালো থাকার। ছেলেবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধু ন্যায়ের পক্ষে মাথা উঁচু করে কথা বলেছেন। তিনি ছিলেন মুক্তিকামী। শৈশব থেকেই অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার তাঁর মনকে গভীর পীড়া দিত। তাঁর এসব গুণাবলীর কথা জানা যায় তাঁর নিজের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে।

বন্ধুরা, তোমরা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যত বেশি পড়বে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তত বেশি জানতে পারবে। তোমরাও দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসবে। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে মানুষের মতো মানুষ হবে। তাহলে তোমরাও একদিন দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবে।

৮ই আগস্ট আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি এক মহীয়সী নারী। তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। জন্মদিনে তাঁর প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা।

বন্ধুরা, এ মাসে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮২তম এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁদেরকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

আগস্টের এ বিশেষ সংখ্যাটি তোমরা ভালোভাবে পড়বে। তবেই তোমরা অনেক অজানা বিষয় ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের জন্য শুভকামনা।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৮৮

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

০৩ কেন তিনি আমাদের জাতির পিতা/ মিনার মনসুর
১২ বঙ্গবন্ধু : আলোকে আলোকময়/অনুপম হায়াৎ
১৯ বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে/মুস্তাফা মাসুদ
৩১ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ/মাসুদ সিদ্দিকী
৪০ বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব তিনি অমলিন/মুহা. শিপলু জামান
৪৭ পনোরোই আগস্ট সেই কালরাত/ মোহাম্মদ ইলইয়াছ
৫০ তোমার বাণী ও আমাদের ঋণ/ ডা. হারুন-অর-রশিদ
৫৪ বিশ্বস্ত সহচর ও নীরব সহযোদ্ধা/ রহিমা আক্তার মৌ
৫৯ বঙ্গবন্ধুর ঈদ/মো. ইকবাল হোসেন
৬১ যারা বেঁচে গিয়েছিলেন সেদিন/মো. মানিক হোসেন চৌধুরী
৬৩ ইতিহাসের সাক্ষী একটি চেয়ার/কামরুল ইসলাম
৬৭ কিংবদন্তীদের চোখে বঙ্গবন্ধু/শাহানা আফরোজ

গল্প

০৮ শোক দিবসের গল্প/রফিকুর রশীদ
১৫ হারিয়ে যেতে নেই মানা/ মোজাম্মেল হক নিয়োগী
২৪ বঙ্গবন্ধু ও সাপে কাটা আবদুল হাই /আহমেদ রিয়াজ
৩৫ প্রতিধ্বনি/মনি হায়দার

সাফল্য প্রতিবেদন

৬৯ শিশুর তিন পর্বতারোহণ/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৭০ পদ্মা সেতুতে বিশ্বকাপ ট্রফি/মেজবাউল হক
৭২ নেচে বিশ্ব রেকর্ড/জান্নাতে রোজী
৭৩ ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন সচেতনতা/মো. জামাল উদ্দিন
৭৫ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফফাত আঁখি
৭৭ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

কবিতাগুচ্ছ

২২ শাফিকুর রাহী
২৩ বাবুল তালুকদার/ আ শ ম বাবর আলী
৩৯ মো. পারভেজ হোসাইন
৪৫ নূর মোহাম্মদ দীন/খসরু পারভেজ
৪৬ নূর আলম গন্ধী/বিজন বেপারী
৫১ সুজন সাজু/ শাকিব হুসাইন
৫৭ সালাম হাসেমী/সোহরাব পাশা/ নাসির আহমেদ
৫৮ দীদার মাহদী/ ইদ্রিস মন্ডল
৬৪ সামিউল ইসলাম
৬৫ সুমন বনিক/ গোলাম নবী পান্না

ছোটোদের ছড়া

৩৯ সাকিব আলম
৬৬ আরিফা আক্তার/তুর্ণ আলম/মহিবুল হক/ মানতাকা তাবাসসুম গুড়িয়া

অ্যালবাম

৫২ স্মৃতির পাতায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : ফারাহনাজ সিদ্দিকী সিমিন
তৃতীয় প্রচ্ছদ : উম্মে মেহজাবিন রাইশা
৬২ মো. আমিনূর সরকার সামি
৭৯ শান্ত/রহমাতুল আলম
৮০ মৌমিতা আক্তার বন্যা/ আয়ান হক ভূঁইয়া

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

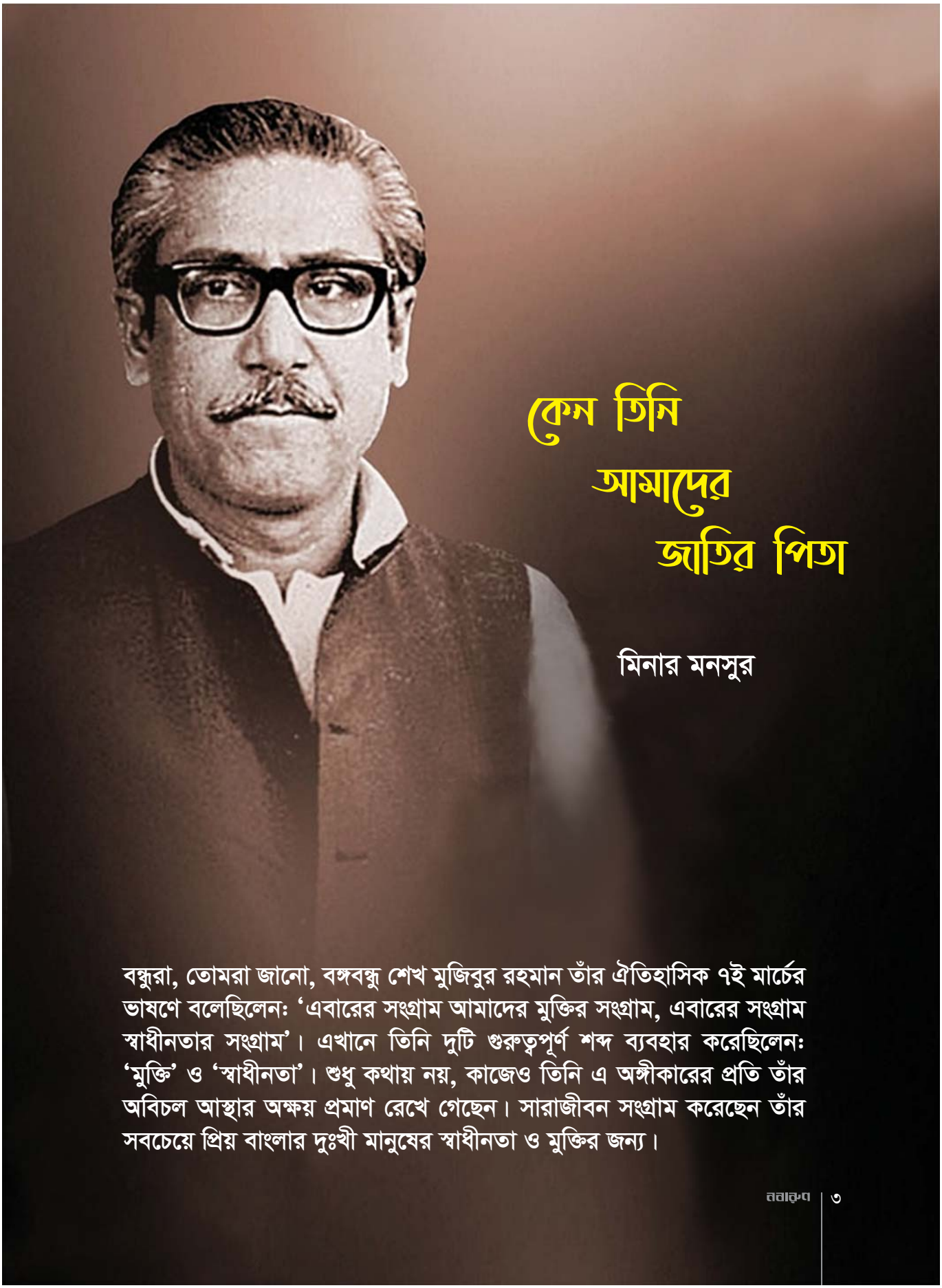

কেন তিনি আমাদের জাতির পিতা

মিনার মনসুর

বন্ধুরা, তোমরা জানো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এখানে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন: 'মুক্তি' ও 'স্বাধীনতা'। শুধু কথায় নয়, কাজেও তিনি এ অঙ্গীকারের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থার অক্ষয় প্রমাণ রেখে গেছেন। সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বাংলার দুঃখী মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য।

বঙ্গবন্ধুর অবিসংবাদিত নেতৃত্বেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ঐতিহাসিক এ অর্জনের পথ ধরেই তিনি জাতির পিতা হয়েছেন। তিনি যদি আর কিছু নাও করতেন, একটি জাতি-রাষ্ট্রের জন্মদাতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতেন। কিন্তু তিনি থ ামলেন না। এবার পা বাড়ালেন তাঁর দ্বিতীয় অঙ্গীকারটি বাস্তবায়নের কঠিনতম পথে। শত শত বছর ধরে শোষিত-বঞ্চিত স্বদেশবাসীর মুক্তির লক্ষ্যে তিনি যখন দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন– তখনই রাতের অন্ধকারে তাঁকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। কারণ এতে কারো কারো স্বার্থে আঘাত লেগেছিল।

বঙ্গবন্ধু বেঁচেছিলেন মাত্র ৫৫ বছর। তার মধ্যে প্রায় ১৩ বছরই কেটেছে কারাগারে। ছেলেবেলায় নানা ধরনের অসুস্থতা কেড়ে নিয়েছে তাঁর মূল্যবান আরো কয়েকটি বছর। তারপর যে ক'টি বছর বেঁচেছিলেন তার প্রতিটি মুহূর্ত তিনি সংগ্রাম করেছেন দেশের মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য। নিজের জীবনের পরোয়া করেননি। ভাবেননি পরিবার-পরিজনের কথা। যখন এক কারাগার থেকে আরেক কারাগারে কাটছে বঙ্গবন্ধুর বন্দিজীবন, তখন পাঁচটি সন্তান নিয়ে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে। আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি সব কষ্ট কেবল হাসিমুখে সহ্যই করেননি, সব সময় পাশেও দাঁড়িয়েছেন বঙ্গবন্ধুর। জুগিয়েছেন সাহস ও অনুপ্রেরণা।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না'। তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে গণহত্যা যজ্ঞ শুরুর পর পরই বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই রাতেই পাকিস্তানি হানাদাররা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে এবং নির্বিচারে হত্যা করে এদেশের নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে। পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয় অসংখ্য মা-বোন। ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয় গোটা দেশকে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে ওরা দাবিয়ে রাখতে পারেনি।

বাংলার দামাল ছেলে-মেয়েরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে। যারা নিজেদেরকে পৃথিবীর সেরা সেনাবাহিনী বলে বড়াই করত সেই পাকিস্তানি বর্বরদেরকে চিরতরে বিতাড়িত করেছে বাংলার মাটি থেকে। প্রায় এক লাখ পাকিস্তানি সৈন্যকে বাধ্য করেছে আত্মসমর্পণে। এক সাগর রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে প্রথমবারের মতো সগর্বে স্থান করে নিয়েছে নতুন একটি দেশ– যার নাম বাংলাদেশ।

প্রশ্ন হলো, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে যা সম্ভব হয়নি, একাত্তরে কীভাবে তা সম্ভব হলো? খুব সহজ উত্তরটি হলো, এটি সম্ভব হয়েছে একটি মানুষের জাদুকরী নেতৃত্বের গুণে। তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান– বাংলার মানুষ ভালোবেসে যাঁকে বঙ্গবন্ধু বলে ডাকেন। একাত্তরের ৭ই মার্চ তিনি বলেছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ'। তিনি সেদিন তাঁর প্রিয় দেশবাসীকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন–'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি...'। 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে'। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। কিন্তু বাংলার মানুষ তাদের প্রিয় নেতার নির্দেশমতো ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার সন্তান। এই গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার আরেক সন্তান চির কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য লিখেছেন: 'বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত/বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত'। শত শত মাইল দূর থেকে আসা পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদারদের বাংলার মানুষ সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল একাত্তরে। আর বাংলার মাটিকে দুর্জয় ঘাঁটিতে পরিণত করার এ অসাধ্যটি সাধন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে বাংলার জনগণকে তিনি যেভাবে উজ্জীবিত ও একতাবদ্ধ করেছিলেন, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

একাত্তরের মার্চে সেই যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম– তাঁর নেতৃত্বে সেটাই

বাস্তব রূপ পেয়েছে মাত্র নয় মাসে। শত শত বছর ধরে এ জনপদের মানুষ যে-স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখারও সাহস পায়নি, সেই স্বাধীনতা এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। কারো বাড়ির ছাদে, কারো গাড়িতে কিংবা কোনো ক্রিকেট ম্যাচের গ্যালারিতে লাল-সবুজ পতাকা হয়ে তা পতপত করে উড়ছে। আবার কেউ-বা বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে উড়ে যাচ্ছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে।

তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও এ স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুকে হাঁটতে হয়েছে দীর্ঘপথ। স্বীকার করতে হয়েছে বিপুল আত্মত্যাগ। সহ্য করতে হয়েছে অনেক অত্যাচার ও নির্যাতন। মৃত্যুর মুখোমুখিও দাঁড়াতে হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু কখনোই বাংলার মানুষের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে তিনি আপোশ করেননি। মায়ের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৪৯ সালেই তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে। আর দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখনো তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। চোখের সামনে ছিল ফাঁসির মঞ্চ– যেটা তাঁর জন্যই তৈরি করা হয়েছিল।

বলা আবশ্যক যে, ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। আর বঙ্গবন্ধুকেও সেই তখন থেকেই এদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পথে নামতে হয়েছিল। কখনো মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার, কখনো বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিচর্চার অধিকার এবং কখনো-বা বাঙালির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার। কেননা অবাস্তব 'দুই জাতিতত্ত্ব' বা ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে জোর করে পাকিস্তানের অংশ করা হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা যে এদেশের মানুষকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে এটা তিনি জানতেন।

কারাগারে বসে বঙ্গবন্ধু মহামূল্যবান তিনটি বই লিখে রেখে গেছেন আমাদের জন্য। বই তিনটি হলো– *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* ও *আমার দেখা নয়াচীন*। আমি সবাইকে বইগুলো খুব

“

একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে গণহত্যাযজ্ঞ শুরুর পর পরই বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই রাতেই পাকিস্তানি হানাদাররা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। নির্বিচারে হত্যা করে এদেশের নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে। পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয় অসংখ্য মা-বোন। ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয় গোটা দেশকে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে ওরা দাবিয়ে রাখতে পারেনি।

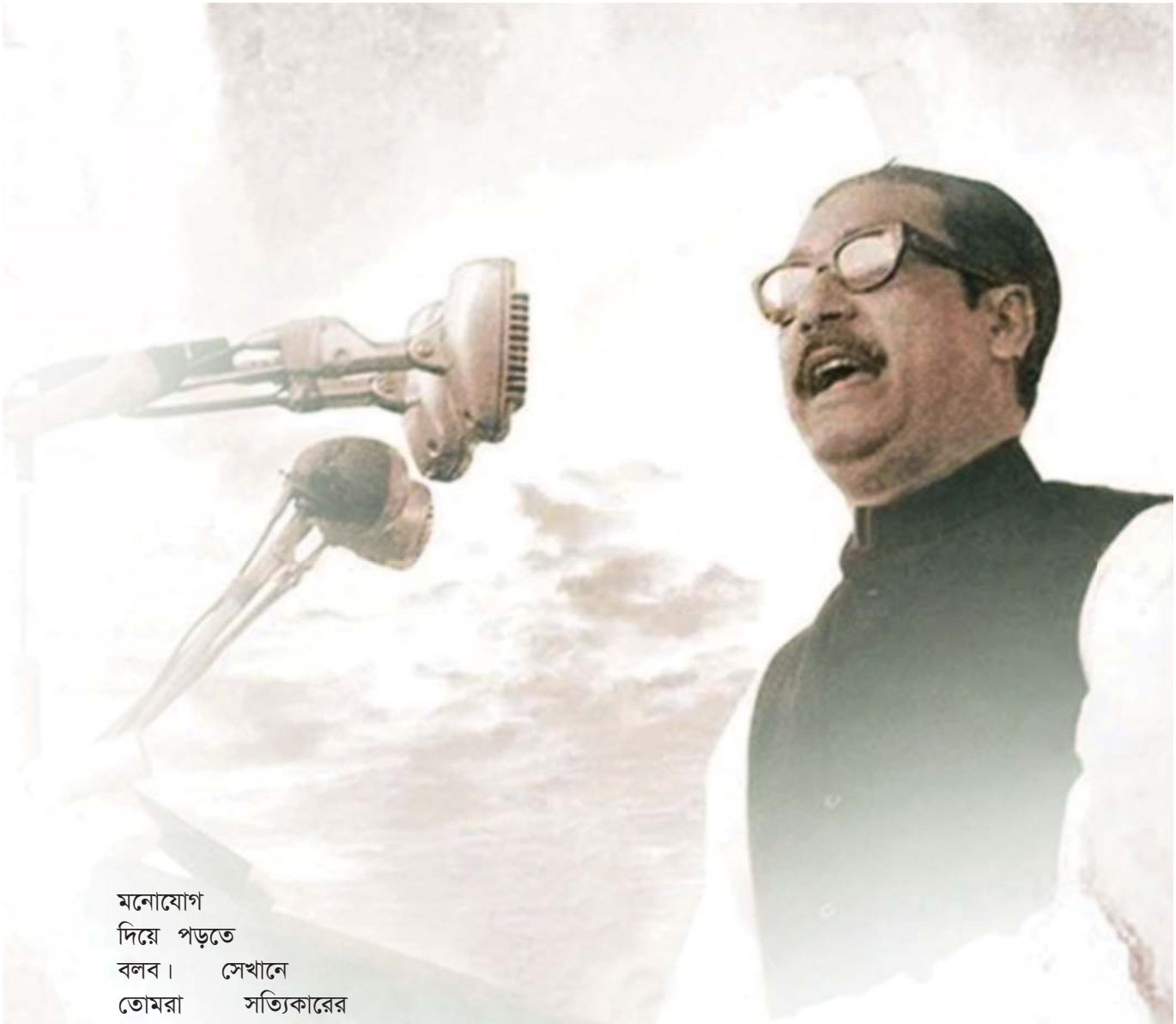

মনোযোগ
দিয়ে পড়তে
বলব। সেখানে
তোমরা সত্যিকারের
বঙ্গবন্ধুকে খুঁজে পাবে। পাবে তাঁর
স্বপ্নের আসল ছবিটি। তারচেয়েও মূল্যবান হলো,
বাংলার একটি অখ্যাত গ্রামের খোকা নামের একজন ছেলে কীভাবে বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা ও বিশ্ববন্ধুতে পরিণত হলেন তার একটি নিখুঁত ছবি রয়েছে এসব গ্রন্থে– যা যুগ যুগ ধরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ দেখাবে।

দুই

বঙ্গবন্ধু কেন রাজনীতি করতেন? এ কথা দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা তাঁকে বহুবার জিজ্ঞেস করেছেন। প্রতিবার তিনি একটাই উত্তর দিয়েছেন। সেটি হলো, দেশের মানুষের প্রতি অন্যরকম এক ভালোবাসাই তাঁকে টেনে এনেছে রাজনীতির মাঠে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন–'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে'। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*)।

এটি কোনো সাধারণ বা লোক দেখানো ভালোবাসা নয়। শৈশবেই গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। লক্ষণীয় বিষয় হলো, তখনো তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হননি। কিন্তু বারবার তিনি দুর্দশা-পীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে

দাঁড়িয়েছেন। বাড়িয়ে দিয়েছেন মমতার হাত। কখনো নিজের গায়ের চাদর খুলে জড়িয়ে দিয়েছেন বস্ত্রহীন বন্ধুর গায়ে। কখনো-বা নিজেদের গোলাঘর খুলে বিলিয়েছেন ধান-চাল। সর্বোপরি, শিরোধার্য করেছেন কবিগুরুর সেই মন্ত্র– 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে'।

বস্তুত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়েই তিনি নজর কেড়েছিলেন অবিভক্ত বাংলার শীর্ষ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। এ মহান নেতার হাত ধরেই বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির হাতেখড়ি। তাঁকেই তিনি রাজনীতির গুরু হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে গুরুর সঙ্গেও আপোশ করেননি। নিজের জীবন বিপন্ন করে কলকাতার দাঙ্গাপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অন্ন তুলে দিয়েছেন দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের মুখে। সবই করেছেন বাংলার চির দুঃখী মানুষের প্রতি অদম্য ভালোবাসা থেকে। কোনো কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে অবশ্যই নয়। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল একটাই; আর সেটি হলো বাংলার ভুখা-নাঙ্গা মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বারবার বলেছেন সে-কথা।

তিন

বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে বহু আরাধ্য সেই স্বাধীনতা এল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের জন্য রাতদিন পরিশ্রম করলেন বঙ্গবন্ধু। নয় মাসের যুদ্ধে সর্বস্ব হারানো মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য হাতও পাতলেন বিশ্ববাসীর কাছে। আমেরিকাসহ কোনো কোনো দেশের বিরোধিতা সত্ত্বেও অনেক সাহায্যও এল। ধীরে ধীরে ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়ালো বাংলাদেশ। সবই হলো কিন্তু দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটল না। বন্ধ হলো না হাহাকার। বন্ধ হলো না শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়ন।

বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছর দেখলেন। বিস্তর আবেদন-নিবেদন করলেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি! কিছুতেই শোষক-নিপীড়ক ও লুটেরাদের হৃদয় গলল না। বঙ্গবন্ধু বুঝলেন, শুধু কথায় কাজ হবে না। এ ঘুণেধরা সিস্টেম বা সমাজ বদলাতে হবে। এবার তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর যুগান্তকারী দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি। উদ্দেশ্য 'মুক্তি'। শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্য থেকে মুক্তি। তিনি প্রচণ্ড আঘাত করতে চাইলেন বহিরাগত ইংরেজ শাসকদের তৈরি করা নিপীড়নমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ভূমিব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর। বললেন যাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তিনি সারাজীবন সীমাহীন দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন, সেই গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারলে তিনি মরেও শান্তি পাবেন না।

শোষক-নিপীড়ক ও লুটেরার দল খুব খেপে গেল। গোপনে গোপনে জোট বাঁধল। ষড়যন্ত্র করল। ভয়ানক ষড়যন্ত্র। তাতে হাত মেলালো দেশি-বিদেশি অনেক মীরজাফর। তারপর রাতের অন্ধকারে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল জাতির পিতার বুক। হিংস্র দানবের মতো তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল বঙ্গবন্ধুর পরিবারের ঘুমন্ত সদস্যদের ওপর। তাদের বর্বরতা থেকে রক্ষা পেল না দশ বছরের নিষ্পাপ শিশু রাসেলও। সেই ভয়াল রাতে স্বদেশি বিশ্বাসঘাতকদের হাতে শাহাদত বরণ করল বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর দুই নিকটাত্মীয় আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও শেখ ফজলুল হক মনিসহ মোট ১৮ জন। মুক্তির মন্দির সোপানতলে সেদিন যারা আত্মবলিদান করেছেন, সেই রক্তরেখা ধরেই আমাদের পথ চলা। অনিবার্যভাবে পঁচাত্তরের দুঃখসহ সেই শোক আজ পরিণত হয়েছে অপ্রতিরোধ্য এক শক্তিতে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। সপরিবারে জীবন দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সারাজীবনের যে স্বপ্ন– এদেশের ভুখা-নাঙ্গা মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর সেই স্বপ্ন থেকে একচুলও বিচ্যুত হননি। তিনি আমাদের শুধু স্বাধীনতাই এনে দেননি, একইসঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির বীজও বপন করে দিয়ে গেছেন। জাতির পিতার রক্তস্নাত সেই পতাকা এখন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যয়দীপ্ত হাতে। সে কারণেই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা এখন আর দূরের কোনো স্বপ্ন নয়। ❑

শিশুসাহিত্যিক

শোকে দিবসের গল্প

রফিকুর রশীদ

রূপার মন খারাপ।

মন খারাপ হলে কিছুতেই সে চেপে রাখতে পারে না। চোখে মুখে তার ছাপ পড়বেই। শুধু মন খারাপের বেলাতেই নয়, মন ভালো থাকলেও সেই ছাপ পড়ে তার চেহারায়। আসলে রূপার মনটা আয়নার মতো টলটলে, যা-ই ঘটুক তার ছবি ফুটে উঠবেই। রূপার বাবা রায়হান সাহেব স্কুল গেটের সামনে মেয়েকে দেখে অবাক। মোটেই অনুমান করতে পারেন না- কী হলো ফুলের মতো ফুটফুটে এই মেয়েটির!

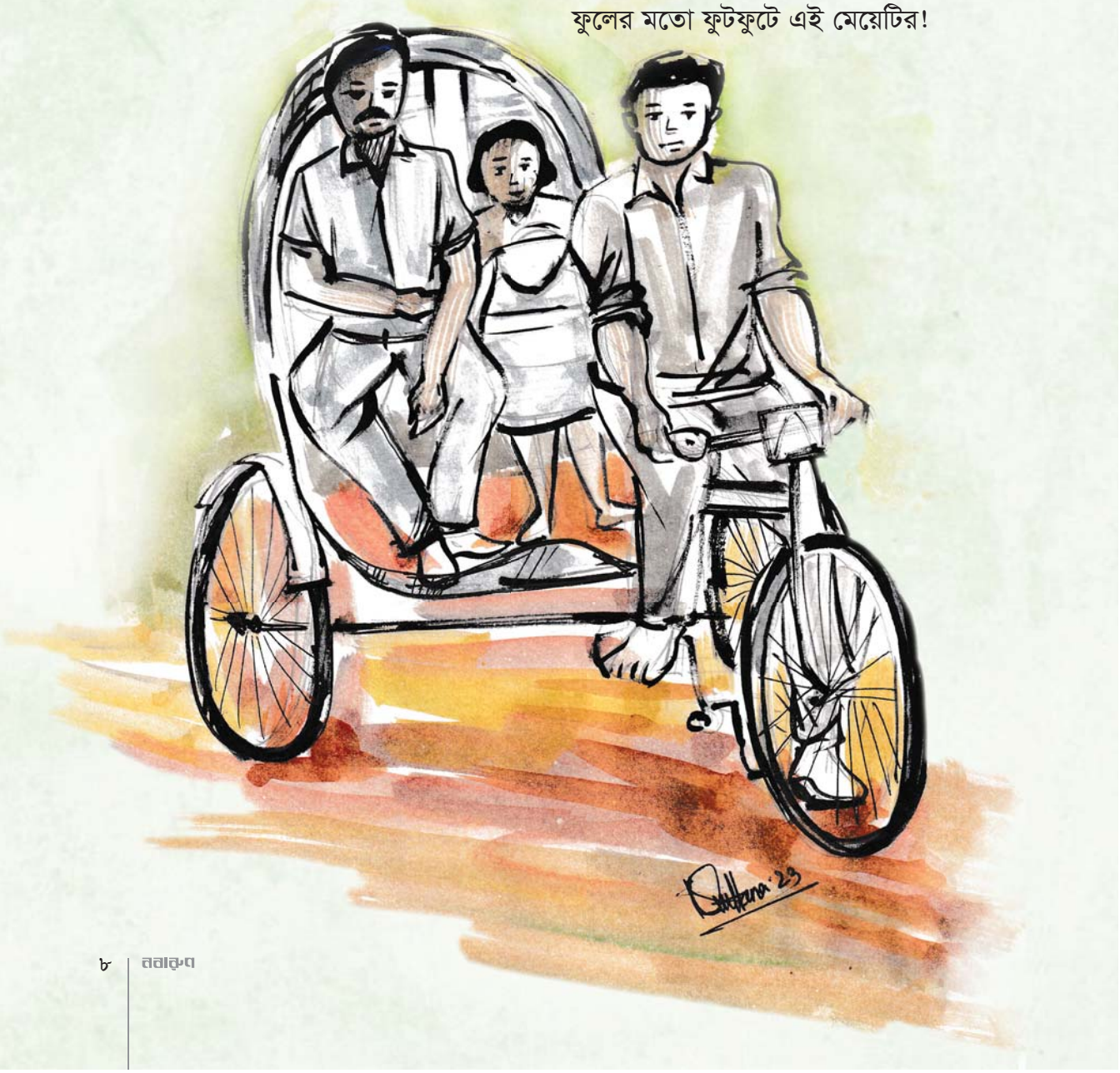

সকালবেলাতেও মন ভালো ছিল রূপার। জাতীয় শোক দিবসে স্কুলে অনুষ্ঠান আছে। নতুন স্কুলে এসে ভর্তি হবার পর রূপার মন ভালো হয়ে যায় নানারকম অনুষ্ঠানের কারণে। একুশে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ...এসব জাতীয় দিবস তো আছেই, আরো নানান অনুষ্ঠান লেগে থাকে ওদের স্কুলে। আর এই সব অনুষ্ঠানের পিছনে লেগে থাকেন কলি ম্যাম। খুব ভালো মানুষ। একদম মায়ের মতো স্বভাব। সব শিশুকে আদর করেন, অনুষ্ঠানের কাজে লাগিয়ে দেন, আবার লেখাপড়াও করান। সত্যি বলতে কী, এই কলি ম্যামের কারণেই নতুন স্কুলটা ভালো লেগে যায় রূপার। গ্রামের স্কুলে তো এত সব অনুষ্ঠান হয় না, আবার কলি ম্যামের মতো টিচারও খুব বেশি নেই। শহরে এসে এই পুষ্পবীথি বিদ্যানিকেতনে ভর্তি হবার পর কলি ম্যামের আদরের কারণেই স্কুলটা খুব ভালো লাগে। বন্ধুরাও খুব ভালো। অনুষ্ঠানের দিন এলে সবাই খুব আনন্দে মেতে ওঠে। শোক দিবস যে আনন্দের দিন নয়, সে কথা মনে রাখলে তো! অনুষ্ঠান হলেই হলো। এই দিনগুলোতে রূপার বিশেষ আনন্দ হয় বাবাকে কাছে পায় বলে। জাতীয় দিবস হলে বাবারও ছুটি থাকে। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে রেখে যান, আবার অনুষ্ঠানের পর বাসায় নিয়ে যান। রোজ রোজ তো বাবাকে এভাবে পাওয়া যায় না। রূপার কাছে তাই জাতীয় দিবসের আনন্দ অন্য রকম। আজও সে বেশ আনন্দে ডগোমগো হয়েই স্কুলে এসেছে। কিন্তু কী হলো এই শেষবেলায়!

রায়হান সাহেব দু'হাত বাড়িয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নেন। রাস্তায় এসে রিকশায় উঠে পাশাপাশি বসেন। তারপর ডান হাতের বেষ্টনিতে তাকে আঁকড়ে ধরে জানতে চান, কী হয়েছে মা তোমার?

রূপা নিরুত্তর।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করেন,

মন খারাপ কেন রূপা?

রূপা একবার ফুঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু মুখে কিছুই বলে না। বাবার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকে।

আমাকে বলবি না মা?

রূপা চুপচাপ।

স্কুলে কিছু হয়েছে?

না, কিছুই বলে না সে। রিকশা এসে বাসার সামনে দাঁড়াতেই নেমে আসে বাবার সঙ্গে। ভেতরে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মা বুকে টেনে নেয় মেয়েকে। স্কুলের ড্রেস বদলে ফ্রেশ হবার জন্য বাথরুমে নিয়ে যায়। অবাক কাণ্ড, বাথরুমে ঢুকে বেসিনের সামনে যেতেই সে হড়হড় করে বমি করে ফেলে। বমিটুকু হবার পরে যেন কিছুটা স্বস্তি হয়, সে শান্ত হয়ে পড়ে। মা তাকে আদর করতে করতে শুধায়,

স্কুলে কিছু খেয়েছিস নাকি?

রূপা ঘাড় দুলায়। মা তবু স্পষ্ট হতে চায়,

খাসনি কিছু?

এতক্ষণে ছোট্ট জবাব দেয় রূপা,

না।

বাবা আবারও জানতে চান,

স্কুলের অনুষ্ঠান কেমন হয়েছে মা?

রূপা এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে, অস্ফুটে স্বরে বলে ওঠে,

রাসেলকেও ওরা গুলি করে হত্যা করেছে বাবা।

চমকে ওঠেন আবু রায়হান, বুকের মধ্যে উথালপাথাল ঢেউ ওঠে, খুব ভাবনা হয় এতদিন পরে রাসেলের কথা উঠছে কেন!

রাসেল তার প্রথম সন্তান। বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ সন্তানের নামে নাম রাখা হয়। না, গুলি করে হত্যা করা হয়নি তাকে। গ্রামের পুকুরের পানিতে ডুবে সে মারা যায়। তারপরই আবু রায়হান সিদ্ধান্ত নেন, কষ্ট হলেও পরিবার পরিজনকে সঙ্গে নিয়েই ঢাকায় থাকবেন। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের জন্য এতদিন সবাইকে শহরে নিয়ে আসা হয়ে ওঠেনি। তার জন্য এমন মূল্য দিতে হবে কে জানত! কত আদরের পুত্র রাসেল সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল! স্বল্প বেতনের চাকরি তার, টানাটানির শেষ নেই। তবু শেষ পর্যন্ত রাসেলের মায়ের আহাজারিতে বিলম্বে হলেও এই ঢাকায় চলে

আসা। নতুন স্কুলে রূপা সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে দেখে খুব স্বস্তি হয়। স্কুলের নানান অনুষ্ঠানে কলি ম্যাম রূপাকে যুক্ত করায় খুব আনন্দ পায়। পিঠাপিঠি সহোদর রাসেলের শোক ভোলা সহজ হয়ে যায় এই কলি ম্যামের আদরে আদরে। আবু রায়হানের ভাবনা হয় রূপা কি আজ সেই কলি ম্যামের আচরণে কোনোভাবে কষ্ট পেয়েছে? কিন্তু এ কথা এখন কাকে শুধাতে যাবে!

শহরে আসার পর রূপা এই প্রথম জাতীয় শোক দিবস পেয়েছে। গ্রামের স্কুলে এই দিন খুব একটা পালিত হয় না বললেই চলে। পনেরোই আগস্টে শহিদদের স্মরণে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল হতে দেখেছে। এ দিন বঙ্গবন্ধুকে

সপরিবারে হত্যা করার কথাও সে শুনেছে। শোক দিবস নিয়ে কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা, শোকগীতি এমনকি নাটকও করা সম্ভব সে কথা কখনো ভাবতেই পারেনি। সেই নাটকে শেখ রাসেলের ভূমিকায় অভিনয় করে ক্লাস ফাইভের রাসেল নাম্বার ওয়ান। পুষ্পবীথি স্কুলের ক্লাস ফাইভে আছে দুজন রাসেল। বড়ো হয়ে রাসেল নাম্বার ওয়ান নিশ্চয়ই নাটক-সিনেমায় খুব ভালো করবে। আজকের নাটকে সে যে অসাধারণ অভিনয় করেছে তা সত্যিই অনবদ্য। ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে অভিশপ্ত সেই রাতে একে একে সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। ছোট্ট রাসেল ঘাতকদের কাছে কাতর অনুনয় করে-মায়ের কাছে যাব। আমি কিচ্ছু চাই না। আমার মায়ের কাছে যেতে চাই।

হায় অবুঝ বালক, দুনিয়ার সব মা কি পারে তার পেটের সন্তানকে রক্ষা করতে! রাসেল ভেবেছিল, মায়ের কাছে গেলেই সে বেঁচে যাবে। ঘাতকেরা তাকে মিথ্যে আশ্বাস দেয়-চল, তোকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিই।

আহা, মায়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। রাসেল তাকাতে পারে না মায়ের দিকে। ডাকতেও পারে না মা বলে। ঘাতকের বুলেট এসে বিদ্ধ করে ছোট্ট রাসেলের কচি বুক। রাসেল আছড়ে পড়ে মায়ের বুকে। মাতা-পুত্রের রক্তের ধারা মিশে যায় নীরবে নিঃশব্দে। একাংকিকার এই দৃশ্য দেখার পর থেকেই রূপার বুক ভার হয়ে আসে বেদনায়, চোখ ভরে যায় অশ্রুজলে। অনুষ্ঠান শেষে স্কুলের বাইরে এসে বাবার দেখা না পেলে কী যে হতো কে জানে! কিন্তু সারা পথে বাবাকে সে কিছুই বলতে পারে না। মায়ের সামনে ডুকরে ওঠে,

রাসেলের কী দোষ মা? ছোট্ট রাসেলকে কেন ওরা গুলি করল?

পৃথিবীর কোনো মা-ই কি পারবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে রাসেলের কী দোষ ছিল?

অন্য এক রাসেল-হারা পিতা আবু রায়হান রূপার মুখে স্কুলের অনুষ্ঠানের বিবরণ শুনে শোকবিহ্বল হয়ে পড়েন। দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার বুক চিরে। অনেকক্ষণ পর রূপা ডেকে ওঠে,

বাবা!

মুখে কিছুই বলতে পারেন না আবু রায়হান। মেয়ের মতো করেই তিনি তখন ডুকরে ওঠেন। ❑

শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক

e½eÜ
Av‡j v‡K
Av‡j vKgq

অনুপম হায়াৎ

যদি প্রশ্ন করা হয় : স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কে?

যদি প্রশ্ন করা হয় : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক কে?

যদি প্রশ্ন করা হয় : বাংলাদেশের জাতির পিতা কে?

যদি প্রশ্ন করা হয় : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কার আহ্বানে পরিচালিত হয়েছে?

যদি প্রশ্ন করা হয় : বাংলাদেশের কোন বাঙালি নেতা জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য প্রায় ১৩ বছর খেটেছেন?

যদি প্রশ্ন করা হয় : জাতিসংঘে কোন বাঙালি প্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন?

যদি প্রশ্ন করা হয় : কোন বাঙালি শান্তিতে জুলিও কুরি পদক পেয়েছেন?

যদি প্রশ্ন করা হয় : কোন বাঙালি 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব পেয়েছেন?

তাহলে এরকম আরো অনেক প্রশ্নের একমাত্র জবাব হবে : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কে জানত বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ বংশে জন্ম নেওয়া মা-বাবার আদরের 'খোকা'ই একদিন 'বঙ্গবন্ধু' থেকে 'বিশ্ববন্ধু' হয়ে ওঠবেন!

আমরা জানি 'ব' হচ্ছে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষার একটি বর্ণ বা অক্ষর। এই 'ব' দিয়েই হয় 'বাংলা', 'বাংলাদেশ', 'বাংলা ভাষা' এবং 'বঙ্গবন্ধু'। এই 'ব'-এর সাথে জড়িত রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস ও

ঐতিহ্য। আর এই 'ব'-এর সার্থক রূপায়ণ হচ্ছেন 'বঙ্গবন্ধু'। বঙ্গবন্ধুর সৌরভে, গৌরবে, সংগ্রামে, শক্তিতে, প্রেরণায়, আলোকে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ও বাংলাদেশ।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানি শাসকবর্গ কর্তৃক তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় আটক থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমানকে রমনা রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র-জনতা কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব দেওয়া হয়। সেই থেকে তিনি এই নামেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। এর আগে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। হয়ে ওঠেন বাঙালির চোখের মণি। আশা-আকাঙ্ক্ষার সূর্য।

বঙ্গবন্ধু এক রাজনৈতিক নক্ষত্র। রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে তিনি ১৯৩৮ থেকে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ২৬ বার জেল খেটেছেন। সত্য ও ন্যায়ের কথা বলতে গিয়ে জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার আদায় করতে গিয়ে তিনি বার বার জেল খেটেছেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসীম সাহসের অধিকারী। তিনি অন্যায়ের কাছে, অসত্যের কাছে মাথা নোয়াতেন না। তিনি জীবনে প্রথম জেল খাটেন গোপালগঞ্জ স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায়। ওই সময় তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে জেল খাটেন।

কিশোর শিক্ষার্থী শেখ মুজিব তখন পরিচিত ছিলেন 'মুজিব ভাই' হিসেবে। ১৯৩৮ সালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরিদর্শনে গেলে ছাত্র মুজিব মুসলমান ছাত্রদের জন্য আবাসিক হোস্টেলের সুবিধা আদায় করে নেন। শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দী কিশোর মুজিবের সাহস দেখে মুগ্ধ হন। মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁকে কলকাতায় গিয়ে দেখা করার কথা বলেন। শেখ মুজিব পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দীর সাথে গিয়ে দেখা করেন। এই সাক্ষাতের ফলে দু'জনের মধ্যে রাজনৈতিক 'গুরু-শিষ্যে'র সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যার ফল হয় খুবই শুভ।

ছাত্রজীবনে শেখ মুজিব ছিলেন খুবই দয়ালু, মানবতাবাদী সেবক ও সংগঠনবাদী। তিনি গরিব শিক্ষার্থীদের নানাভাবে সহায়তা করতেন। একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে 'মুসলিম সেবা সমিতি'র সদস্য হয়ে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সাহায্য তুলতেন। কলকাতায় কলেজের ছাত্র অবস্থায় তিনি দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধপীড়িত ও দাঙ্গায় বিধ্বস্ত মানুষের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেন। এটা ১৯৪৩–১৯৪৭ সালের কথা।

শিক্ষকের প্রতি শেখ মুজিবের ছিল অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও প্রাইমারি স্কুলের একজন বয়স্ক শিক্ষকের পা ছুঁয়ে সালাম করে তাঁকে কোলে নিয়ে নিজের (প্রধানমন্ত্রীর) আসনে বসিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

বাংলাদেশ, বাংলা সাহিত্য, বাংলা সংস্কৃতি এবং লেখক-সাহিত্যিক-শিল্পীদের প্রতি ছিল তাঁর দরদ ও সুসম্পর্ক। তিনি ১৯৪৭–৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল প্রসাদ সেন, বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন তাঁর প্রিয় সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথের গান 'আমার সোনার বাংলা', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা 'চল চল চল' গান, অতুল প্রসাদের 'আ মরি বাংলা ভাষা', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি' ইত্যাদি ছিল তাঁর প্রিয় গান ও কবিতা।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন সিরিয়াস পাঠক। জেলখানায়ও তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বই ও পত্রপত্রিকা পাঠ করতেন। জেলখানায় বন্দি অবস্থায় থেকেও তিনি রচনা করেছেন 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা'। এই পাণ্ডুলিপি তাঁর মৃত্যুর অনেক পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর রাজনৈতিক সাহিত্যের ইতিহাসে এ দুটি বই অমূল্য সংযোজন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কার্যক্রম, গুণাবলি, জনসম্পৃক্ততা ছিল তুলনাহীন। তাঁর ভাষণ, বক্তৃতা, শব্দের ব্যবহার,

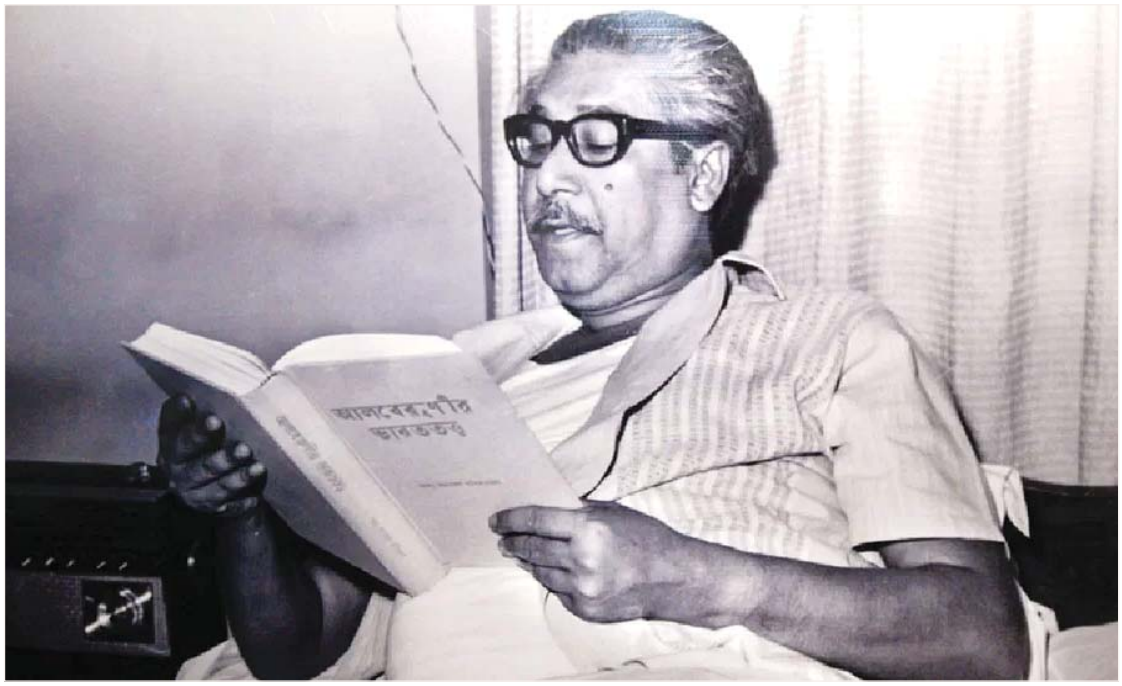

উপস্থাপন রীতি ছিল বিস্ময়কর ও সুনিপুণ। আমেরিকার সাপ্তাহিক নিউজ উইক (৫ই এপ্রিল ১৯৭১) তাঁকে আখ্যা দিয়েছিল 'রাজনীতির কবি' হিসেবে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ ইতিহাসের অমূল্য সংযোজন হয়ে আছে। জাতিসংঘের 'ইউনেস্কো' এই ভাষণকে 'বিশ্ব সংস্কৃতি ঐতিহ্যের সম্পদ' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। তাঁর এই ভাষণের ফিল্ম ফুটেজ বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন মুক্তি আন্দোলনের চলচ্চিত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বঙ্গবন্ধু জনসাধারণকে আপন ভাই-বোন হিসেবে মনে করতেন। তিনি ভাষণে বলতেন ' আমার ভাই, আমার বোন'। আর সব সময় তিনি বাংলাদেশকে বলতেন 'আমার দেশ, আমার মাটি'। ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পারিবারিক পরিবেশে ছিলেন বটবৃক্ষের মতো। তাঁর শ্রদ্ধা, স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসায় সিক্ত ছিলেন পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজন। তিনি ছিলেন অকুতোভয় চিত্তের অধিকারী। পুলিশ, মিলিটারি, ঘাতক, শত্রুকে তিনি ভয় পেতেন না। নজরুলের ভাষায় তিনি ছিলেন ' চির উন্নত মম শির'। ১৯৭১ সালের ২৫-২৬ শে মার্চ রাতে বর্বর পাকিস্তানিরা যখন হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তখন তিনি নিজের ধানমন্ডির বাড়িতেই ছিলেন। তিনি সবাইকে নিরাপদে চলে যেতে বললেও নিজে পালিয়ে যাননি। পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। অতঃপর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হলে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসেন বিজয়ীর বেশে।

বঙ্গবন্ধু আজ নেই। তিনি সপরিবারে শহিদ হন ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাতে। কিন্তু আছে তাঁর প্রিয় বাংলাদেশ, ত্যাগের আদর্শ ও লক্ষ্য। তাঁর রক্তাক্ত পথ বেয়ে এগিয়ে চলছে স্বপ্নের বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু এক জ্বলন্ত সূর্য। তাঁরই আলোকে উদ্ভাসিত এদেশের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতি। বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের অমলিন অধ্যায়। তিনি আমাদের শক্তি, সাহস, সংগ্রাম ও স্বাধীনতার প্রতীক। ❑

গবেষক ও সাহিত্যিক

গল্প

হারিয়ে যেতে নেই মানা

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

বাগেরহাটের মেন্ডারিয়া গ্রামের আবদুল মালেক ফকিরের সুনাম আছে দশ গ্রামে। তিনি একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন, বর্তমানে অবসরে আছেন। তার পরিবারটি খুব শান্তিপূর্ণ। তার দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে চঞ্চল রাজা ঢাকায় চাকরি করে। চঞ্চল রাজার দুই যজম ছেলে রনি ও টনি। আবদুল মালেক ফকির দুই নাতিকে নিয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটান। চঞ্চল রাজার স্ত্রী নাজিয়া ঠিক মেয়ের মতোই শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখেন। বিয়ের পরদিনই শ্বশুর-শাশুড়ির মন কেড়ে নেয় সুশিক্ষিতা নাজিয়া। বিয়ের পরদিন আবদুল মালেক ফকিরকে নাজিয়া বলেছিলেন, বাবা, আপনার মেয়েকে যেমন তুই করে ডাকেন তেমন আমাকেও তুই করে ডাকবেন। আর তারা যেমন আপনাকে তুমি করে বলে, আমিও তেমন তুমি করে বলব।

আবদুল মালেক ফকিরের মন সেদিনই ভরে গিয়েছিল নাজিয়ার কথা শুনে। সত্যি, এমন ঘটনা কি বাংলাদেশে ঘটেছে? শুধু কি তাই? চঞ্চল রাজা ঢাকায় চাকরি করে।

পরিবার নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু নাজিয়া বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে গ্রামে ফেলে ঢাকায় যাবে না বলে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে। রনি ও টনিকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। ওরা যেমন দুষ্টের সেরা তেমনই পড়াশোনাতেও সেরা।

কদিন আগে হলো কী, রনি ও টনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকালের নাশতা খাওয়ার পর দুই ভাই হাওয়া। সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। নেই। সারা গ্রাম তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। নেই।

আবদুল মালেক ফকির সকাল দশটায় বাড়ি থেকে বের হয়ে স্থানীয় বাজারে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করেন। বাড়ির কাজের লোককে দিয়ে সেখানেও খবর পাঠানো হলে তিনি মৃদু হাসলেন। কিছুই বললেন না। কাজের লোক বাড়িতে এসে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে। বাড়ির ভেতরে নাজিয়া ও রনি-টনির দাদি দুজনে মিলে মনে হয় অনুষ্ঠান করে কাঁদতে বসেছে। তাদের কান্না শুনে আশপাশের বাড়ির মেয়েরা দলবেঁধে দেখতে এসে তারাও কাঁদতে শুরু করে।

গেন্ডারিয়া গ্রামের তরুণ ছেলে কলেজ পড়ুয়া রফিক গ্রামের কোনো সমস্যা হলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। রনি ও টনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং মালেক ফকিরের বাড়িতে কান্নাকাটি দেখে সে একটি মাইক সংগ্রহ করে বের হয়ে পড়ে। মাইকিং করে জানাচ্ছে, রনি ও টনি নামের দশ-বারো বছরের যমজ দুই ভাইকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের সন্ধান পাওয়া মাত্র গেন্ডারিয়া গ্রামের আবদুল মালেক ফকিরের বাড়িতে পৌঁছায়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধীরে ধীরে মাইকের আওয়াজটি চায়ের স্টলে বসে থাকা আবদুল মালেক ফকিরের কানেও আসে। এক সময় বাজারেও মাইকিং করে রফিক চিতলমারি থানার দিকে চলে যায়। আবদুল মালেক ফকির চায়ের স্টলে বসে মিটমিট করে হাসেন যেন কোনো কিছুই হয়নি। তবে তিনি চিন্তিত হন এই ভেবে যে, বাড়িতে হয়ত কান্নার রোল পড়ে গেছে।

শুধু কি রনি ও টনি? তাদের স্কুলের আরও চার বন্ধু মিলে চিতলমারি বাসস্ট্যান্ড থেকে রওনা হয়েছে। একটি লোকাল বাসে চড়ে তারা ছুটছে। কয়েক কিলোমিটার পথ চলতেই বাসের পেছনের একটি চাকা ব্লাস্ট হয়ে যায়। চাকাটি বদলাতে চলে যায় আরও ঘণ্টাখানেক। না-হয় এতক্ষণে তারা পৌঁছে যেতে পারত। দুপুর প্রায় হয়ে গেছে। খিদেয় পেট পুড়ে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার আনন্দে সকালের নাশতাও তেমন করে খাওয়া হয়নি। আর বাস চলছে তো চলছেই। খাওয়ার মতো কোনো অবস্থাও নেই। যে টাকা নিয়ে এসেছে তা কেবল যাওয়া-আসার ভাড়া। ওরা মনে করেছিল দুপুরেই বাড়ি ফিরতে পারবে। কিন্তু বাসের চাকা পাংচার হওয়াতে যত অঘটন ঘটল।

স্থানীয় বাজার থেকে দুপুরে আবদুল মালেক ফকির বাড়িতে আসেন। বাড়িতে এসে দেখেন বউ-শাশুড়ি মিলে অনুষ্ঠান করে কাঁদতে বসেছে। রনি ও টনি কোথায় গেল? তাদের কান্না দেখে আবদুল মালেক ফকির ভড়কে যান এবং কোনো কিছু বলার সাহস পান না। তিনি একবার বাড়ির ভেতরে গিয়ে শুধু বলতে চেয়েছিলেন, কাঁদবে না, ওরা এসে পড়বে। কিন্তু কী মনে করে, অথবা ভয়ে তিনি তখনই বাড়ির বাইরে এসে বৈঠকখানায় চেয়ারে চুপ করে বসে থাকেন। তিনিও খিদেয় ভুগছেন। কিন্তু বাড়িতে আজ রান্না হয়নি। কী খাবেন?

দুপুরের শেষ দিকে ওরা গন্তব্যে পৌঁছায়। আহা! চোখ জুড়িয়ে গেল।

আবদুল মালেক ফকিরের খিদে আর সহ্য হচ্ছে না। তিনি এবার ভেতরে গিয়ে বললেন, এবার কান্নাকাটি রেখে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো।

নাজিয়া আজকেই প্রথম শ্বশুরের মুখের ওপর কড়া মেজাজে কথা বলল, আপনার এত খিদা কেন? আমার রনি-টনিরে পাওয়া যাচ্ছে না তা কি জানেন না? এরপরও মানুষের খিদা লাগতে পারে?

নাজিয়ার কথা শুনে আবদুল মালেক ফকিরের মন খারাপ হয়। তিনি কী করবেন বুঝতে পারছেন না। তিনি আবার বললেন, এই বয়সে ছেলেরা কোথাও বের হতে পারে না? এই বয়সে কি কেউ হারায়?

নাজিয়া বলে, আপনি জানেন না। কত ছেলেধরা আছে। কত খারাপ মানুষ ছেলেদের ধরে নিয়ে মুক্তিপণ আদায় করে।

এত দুশ্চিন্তা করো না। বিকেল পর্যন্ত দেখো। তারপর দেখা যাবে কী করা যায়।

রফিক চিতলমারি থানায় গিয়ে সাধারণ ডায়েরি করেছে যে, গেন্ডারিয়া গ্রামের চঞ্চল রাজার দুই যমজ ছেলে রনি ও টনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রফিক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ করে বলে, আপনারা যদি একটু তৎপর না হন তাহলে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, বাবা তুমি এখন বাড়িতে যাও। আমরা সব জায়গায় খোঁজখবর নিচ্ছি। আমি বিভিন্ন থানায় ফোন করে দিচ্ছি।

রফিক আশ্বস্ত হয়ে মাইকিং করতে করতে বাড়িতে ফিরে গিয়ে নাজিয়াকে থানার জিডির কথা বলে। নাজিয়ার কান্না কিছুটা থামে। মনে হয় থানার পুলিশই হয়ত ওদের উদ্ধার করে দিতে পারবে।

রনির বন্ধুরা আড্ডায় মেতে ওঠে। তারা বাইনোকুলার দিয়ে দেখে দীর্ঘ এক সেতু। পদ্মা সেতু। রনি বলে, আমি অবাক হয়ে গেছি এত সুন্দর আর এত দীর্ঘ সেতু বাংলাদেশে!

রনির বন্ধু বাদল বলে, আমার কাছে বাইনোকুলারটা দে। আমিও দেখি। বাদলের আগে কামাল টান দিয়ে নিয়ে নেয়। বাদল রাগ করে দূরে সরে যায়। তারপর তার রাগ ভাঙায় টনি। পদ্মার পশ্চিম পাড় থেকে ওরা নদী দেখছে, আর আনন্দে যেন শরতের মেঘের মতো আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাসে বসে থেকে যে খিদা অনুভব করেছিল তা ভুলেই গেছে। টনি বলে, সেতুর এই রূপ আমি কোনো দিন ভুলতে পারব না। জীবন আজ সার্থক হয়ে গেল।

ওদের বন্ধু নিশাত কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাদল জিজ্ঞেস করে, তুই কাঁদছিস কেন রে নিশাত?

নিশাতের কান্না আরও বেড়ে যায়। অনেকক্ষণ পর তার কান্না থামলে সে বলল, তিন বছর আগে আমার বাবা লঞ্চডুবিতে মারা যায় তোরা জানিস না? যদি সেতুটি আগে হতো তাহলে হয়ত আমার বাবা বেঁচে থাকত। হঠাৎ করেই সবার মন খুব খারাপ হয়ে যায় এবং মনে হয় নিশাতের বাবার মৃত্যুর কষ্টে ওদেরও মন ভারী হয়ে ওঠে।

রনি বলে, নিশাত, চল। তোর বাপের জন্য তোর জন্য খুব খারাপ লাগছে।

সন্ধ্যার আগে আবদুল মালেক ফকির তাঁর স্ত্রী ও নাজিয়াকে বলেন, এই বয়সে ছেলেপুলের কত জায়গায় যেতে ইচ্ছে করে। এজন্য কি হারিয়ে যায়? হয়ত কোথাও গেছে ঘুরতে।

আবদুল মালেক ফকিরের স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জানো ওরা কোথায় গেছে?

আবদুল মালেক ফকির মনে মনে বলেন, এই বুঝি ধরা খেয়ে গেলাম। তিনি মিথ্যা কথাও বলেন না। আবার সত্য কথা বললে ধরাও খাবেন। কী করা যায় ভেবে বললেন, এই তরকারি কে রান্না করেছে?

আমি। নাজিয়ার কোনো কাজ করার মতো শক্তি নেই। সে মরার মতো বিছানায় পড়ে আছে।

আহা রে! মায়ের মন তো। ডাল আছে? একটু ডাল নিয়ে আসো।

দিনের আলো কমে আসছে। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ত এখনই ধেয়ে আসতে শুরু করবে। পদ্মা নদীর পাড়েই একটি দোকান থেকে কলা আর বনরুটি কিনে খায় ওরা। ভাত কিনে খাওয়ার মতো টাকা নেই। ওরা বাড়ির পথ ধরে।

বাড়িতে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পার। সন্ধ্যার বাতি জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে নাজিয়া আবার কাঁদতে শুরু করে। সারাদিন কেঁদেকেটে এখন গলা থেকে কোনো আওয়াজ বের হয় না। শরীরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিছানায় শুয়ে দুই হাত নেড়ে কেবল আহাজারি করছে। এই সময় রনি ও টনি এসে হাজির হয়।

নাজিয়া বিছানা থেকে হুড়মুড় করে নেমে দুই ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আবার আরেক দফা কাঁদেন। মায়ের কান্না দেখে ওরাও হতভম্ব।

রাতে আবদুল মালেক ফকির, রনি ও টনি একসঙ্গে খেতে বসেছে। নাজিয়া ও তার শাশুড়ি দুজনে ওদের খাবার তুলে দিচ্ছেন। এবার আবদুল মালেক ফকিরের মুখে হাসি। তিনি বলেন, এই বয়সে না কোথাও যাওয়ার অনেক আনন্দ। তাই না রে রনি-টনি।

রনি-টনি হাসতে থাকে। তুমি কি কোথাও হারিয়ে যেতে দাদা ভাই।

আবদুল মালেক ফকিরের মুখে যেন কষ্টের ছায়া পড়ে। তিনি বলেন, তোরা তো আমাকে বলে গিয়েছিলি। কিন্তু আমি বাড়িতে এসে তোদের মা ও দাদির কান্নার উৎসব দেখে সত্য কথাটি আর বলার সাহস পাইনি।

নাজিয়া রাগ করে বলে, বাবা তুমি কাজটা ভালো করোনি।

আবদুল মালেক ফকির বলেন, আমার জীবনেরও এমন একটি ঘটনা আছে। সবাই শোনো। তিনি বলতে থাকেন, একবার আমি বাড়িতে কাউকে না বলে মাদারিপুর চলে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখার জন্য। তিনি আজ নেই। তিনি এমনই এক মহান নেতা ছিলেন তাঁকে দেখলে বা তাঁর কথা শুনলে ওনার ভক্ত না হয়ে উপায় থাকত না। তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত। সারা পথে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা আমার মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আহা! এমন নেতা কয়টি দেশের মানুষে পায়!

আজকে তোরা তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনার গড়া পদ্মা সেতু দেখতে গিয়েছিস, আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল রে... আমি তোদের কথা বাড়িতে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার এত আনন্দ হয়েছিল! আনন্দের স্রোতে সব ভুলে গিয়েছিলাম।

আবদুল মালেক ফকিরের চোখে পানি এসে যায়। তাঁর চোখের পানি দেখে অন্যরাও পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে যায়। ❑

শিশুসাহিত্যিক

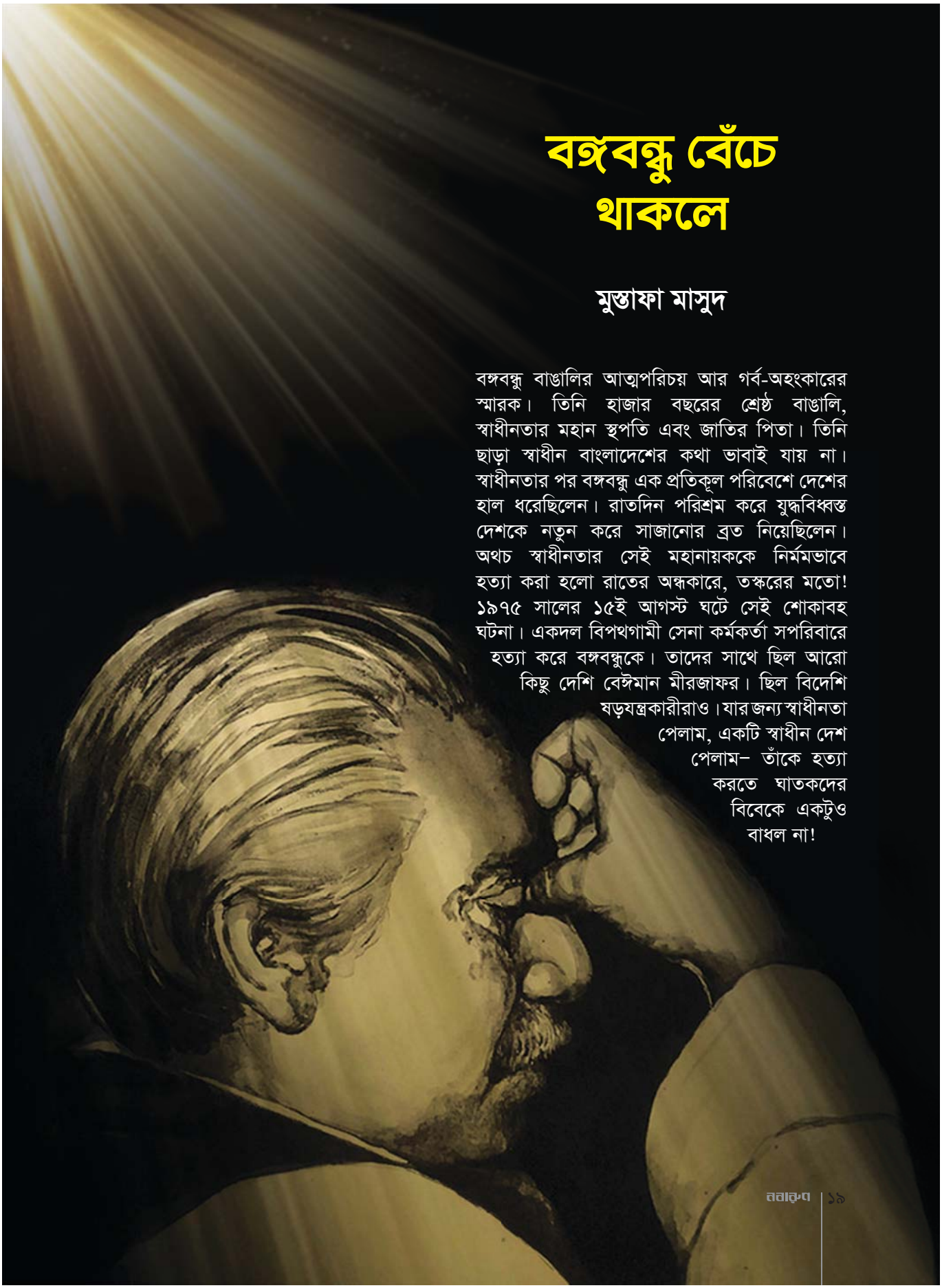

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে

মুস্তাফা মাসুদ

বঙ্গবন্ধু বাঙালির আত্মপরিচয় আর গর্ব-অহংকারের স্মারক। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি এবং জাতির পিতা। তিনি ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের কথা ভাবাই যায় না। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু এক প্রতিকূল পরিবেশে দেশের হাল ধরেছিলেন। রাতদিন পরিশ্রম করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নতুন করে সাজানোর ব্রত নিয়েছিলেন। অথচ স্বাধীনতার সেই মহানায়ককে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো রাতের অন্ধকারে, তস্করের মতো! ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘটে সেই শোকাবহ ঘটনা। একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা সপরিবারে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুকে। তাদের সাথে ছিল আরো কিছু দেশি বেঈমান মীরজাফর। ছিল বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরাও। যার জন্য স্বাধীনতা পেলাম, একটি স্বাধীন দেশ পেলাম– তাঁকে হত্যা করতে ঘাতকদের বিবেকে একটুও বাধল না!

কেন তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করল? কারণ, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন একটি সুখী-সুন্দর দেশ– যেখানে মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো ভাত পাবে। পরনের কাপড় পাবে। কেউ তাদের শোষণ করবে না। ঠকাবে না। অত্যাচার-নির্যাতন করবে না। তিনি আরও চাইলেন– ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সব মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করুক। ধর্মীয় ভেদ-বিভেদ নয়, তিনি বললেন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা। পাশ্চাত্যের সেক্যুলারিজম বা তথাকথিত 'ইহজাগতিকতাবাদ' নয়; বঙ্গবন্ধুর দর্শনে ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য ভিন্ন– ধর্মকে বাদ দেওয়া নয়, যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। এর মূল চেতনা হলো: ধর্ম যার যার, কিন্তু রাষ্ট্র সবার। যারা সমাজে শোষণ আর বৈষম্য জিইয়ে রাখতে চায়। যারা চায় না গরিব মানুষের মুখে হাসি ফুটুক, বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়াক, স্বাবলম্বী হোক– তারা বঙ্গবন্ধুর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। যারা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করেছিল এবং যারা ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চায়, তারাও বঙ্গবন্ধুর শত্রুদের সাথে হাত মেলালো। ধর্মনিরপেক্ষতাকে তারা ধর্মহীনতা বলে অপপ্রচার চালাতে লাগল। অথচ, বঙ্গবন্ধুই ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। মদ-জুয়া, রেসের ঘোড়দৌড়-আইন করে নিষিদ্ধ করেন। মাদ্রাসা বোর্ড পুনর্গঠন করেন। তবলীগ জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের জন্য কাকরাইলে জমি বরাদ্দ দেন। ইসলামের স্বার্থে আরও অনেক কাজ করেন তিনি।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক– স্বাধীন দেশের এই মহান স্থপতিকে, জাতির পিতাকে হত্যা করে কাদের লাভ হয়েছিল? ক্ষতিই বা কাদের হয়েছিল? লাভ হয়েছিল স্বাধীনতার শত্রুদের। যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। বিভেদ আর সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ায়, তাদের লাভ হয়েছিল। কারণ, বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে তো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর কোনো সুযোগ ছিল না। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর তারা আবার দাপটের সাথে ফিরে এল। তারা পাকিস্তানি ভাবধারায় আবার সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের রাজনীতি করার সুযোগ পেল। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের দালাল এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া কোনো কোনো ব্যক্তি পরবর্তীতে মন্ত্রীও হলো। এদের মধ্যে শাহ আজিজুর রহমান, আবদুল আলিম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা যায়। তাদের গাড়িতে উড়ল শহিদের রক্তে রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। এর চেয়ে বড়ো লাভ তাদের জন্য আর কী হতে পারে! শুধু তাই নয়, তারা ব্যবসা-বাণিজ্য আর অর্থ-বিত্তে ফুলে-ফেঁপে উঠল। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে তারা কি তা করতে পারত? পারত না।

আর ক্ষতি হলো কার বা কাদের? বিপুল ক্ষতির শিকার হলো এই দেশ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল– বাংলাদেশ হবে শোষণ-বঞ্চনাহীন একটি অসাম্প্রদায়িক উদারনৈতিক আদর্শের দেশ। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শহিদ হওয়ার পর দেশ সেই মূল চেতনা থেকে সরে এল। তখনকার এবং পরবর্তী শাসকেরা রাতারাতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর আদর্শ বাদ দিয়ে পুরনো পাকিস্তানি ধারায় ফিরে যেতে চাইল। স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-আল বদরদের কদর বেড়ে গেল, আর মুক্তিযোদ্ধারা হলেন অবহেলিত। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলো ঝলমল পথ থেকে অন্ধকার গুহায় ছিটকে পড়ল দেশ। ধর্মের নামে রাজনীতি আর রাজনীতির নামে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটল। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বাড়ল। ভয়াবহ জঙ্গিবাদ ক্রমে ক্রমে শিকড় গেড়ে বসল। বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশে আরও ক্ষতি হলো সেই সব মানুষের, যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে, শান্তি ও অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে। নিকট-অতীতে সাম্প্রদায়িক শক্তির বাড় এতই বেড়েছিল যে, তাদের কেউ কেউ জাতীয় পতাকা পোড়ানো ও শহিদমিনারের অবমাননা করার ধৃষ্টতাও দেখিয়েছে। কোনো কোনো গোষ্ঠী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে নানা আজেবাজে কথা বলেছে। আজও দেখা যায়, বিরোধী গোষ্ঠীর রাজনীতির একই ট্রেন্ড, একই ধারা। ধর্ম নিয়ে সরাসরি খেলা না চললেও কৌশলে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার বিরুদ্ধেই তারা আঘাত হানতে চায়; অসাম্প্রদায়িকতার লেবাসে সাম্প্রদায়িক ধারাই পোষণ করে তারা। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের সাথে তাদের গোপন আঁতাত আজ এক ওপেন সিক্রেট।

সুখের কথা, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগিতা করেছিল, মানুষ মেরেছিল, মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল তাদের বিচার চলছে বিশেষ আদালতে– আন্তর্জাতিক

অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। বিচারে বেশ ক'জনের সর্বোচ্চ শাস্তি হয়েছে। অন্যদের বিচারও চলছে। এদের বিচার বন্ধ করার জন্য বাধা দেওয়ার সাহসও পেয়েছে তারা। হরতাল-ভাঙচুর-মানুষ হত্যা করতেও তারা পেছপা হয়নি। অথচ বঙ্গবন্ধুকে আমরা অসময়ে না হারালে এই অশুভ স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী অঙ্কুরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, মাথা তুলতে পারত না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারত না। তবে অনেক বিলম্বে হলেও বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি, তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা সেই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন। সেদিন যা সহজ ছিল, আজ তা অনেক কঠিন আর বাধাপূর্ণ হলেও সংকল্পে অবিচল নেত্রী সাহসের সাথে এগিয়ে চলেছেন।

এ কাজে তিনি যে সফল হয়েছেন, যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ দণ্ড কার্যকরই তার দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার ও সাজা একদিকে দেশকে কলঙ্কমুক্ত করেছে, অন্যদিকে শহিদদের আত্মা শান্তি পাবে; পরম সান্ত্বনা পাবে শহিদদের স্বজনেরা, নির্যাতিত-ক্ষতিগ্রস্তরা। বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে গরিব-দুঃখী অসহায় মানুষের যে ক্ষতি হয়েছে, তা অপূরণীয়। বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের স্বপ্ন ছিল দুঃখী মানুষের দুঃখ দূর করা, তাদের মুখে হাসি ফোটানো। তিনি গ্রামে গ্রামে সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা চালু করে গরিব কৃষক ও ভূমিহীনদের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দারিদ্র্য হটিয়ে জাতিকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন: 'ভিক্ষুক জাতির কোনো ইজ্জত নাই... একটা জাতি যখন ভিক্ষুক হয়, মানুষের কাছে হাত পাতে: আমারে খাবার দাও, আমারে টাকা দাও– সেই জাতির ইজ্জত থাকতে পারে না। আমি সেই ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না।'

তিনি সমাজের দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, কালোবাজারি, চোরাচালানকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে সবার প্রতি আহ্বান জানালেন: 'দুর্নীতিবাজ খতম করো।' সমাজের এই দুষ্টচক্র সবাই বঙ্গবন্ধুর শত্রু হয়ে গেল নিজেদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের কারণে। তারা দেশের স্বার্থ দেখল না। কোটি কোটি সাধারণ মানুষের কথা ভাবল না। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের মানে বুঝল না। তাদের সবার হিংসার আগুনে পুড়তে হলো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে। আজ যারা শিশু-কিশোর বা তরুণ-যুবা, তারা হয়ত এখনই পুরোটা বুঝতে পারবে না, বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে এ জাতির কী বিশাল ক্ষতি হয়েছে। তিনি যেভাবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তা অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেয় সমাজ-শত্রুরা। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শত্রুরা।

অথচ বঙ্গবন্ধুকে যদি অকালে জীবন দিতে না হতো তাহলে অনেক আগেই বাংলাদেশ 'সোনার বাংলা'য় রূপান্তরিত হতো– একথা আজ বিশ্বাসের সাথেই বলা যায়। আজ এত বছর পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যে কঠিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে, যে বন্ধুর-কণ্টকময় পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে তাঁকে, তা অনেকটাই সহজসাধ্য ও মসৃণ হতো। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে যে অন্ধকারের কালো দৈত্যরা গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, তারা চিরকালই গুহার মধ্যে আবদ্ধ থাকত। কিন্তু জাতির ললাট লিখন ছিল ভিন্নতর; তাই আমরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারিয়েছিলাম অকালে, অসময়ে। পনেরোই আগস্ট তাই আমাদের কাছে একদিকে মহা শোকের দিন, অন্যদিকে স্বাধীনতা বিরোধী ও সমাজ শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শপথ নেওয়ারও দিন। আসুন আমরা সেই শপথে সোচ্চার হই, ইস্পাত দৃঢ় পায়ে সামনে এগিয়ে চলার প্রতিজ্ঞা করি। ❑

শিশুসাহিত্যিক

বিশ্ব সভায় আপন আভায়

শাফিকুর রাহী

সংকট আর সন্ধিক্ষণে কাটল সারা কাল,
দস্যু খুনির দানব থাবায় ছিঁড়ল নায়ের পাল !
শোককে তিনি শক্তিতে রূপ দিতে গিয়ে ভাবেন,
কোথাও কি আম্মা-আব্বার সোহাগ স্নেহ পাবেন?
অমন সময় মুজিবপ্রেমী লাখো মানুষের ঢলে
দীর্ঘ দুঃখের শোকের সড়ক ভাসল চোখের জলে ।

মুজিব পাগল কোটি মানুষ তোমার আপনজন
তোমার নামে জীবন দিতেও রাজি সারাক্ষণ ।
পিতার স্বপ্ন করতে সফল দীপ্ত শপথ পাঠে,
ভাঙতে আঁধার বাধার পাহাড় জাগল মানুষ মাঠে ।
কলঙ্কিত অভিশপ্ত জাতিকে উদ্ধারে-
বিশ্ব সভায় আপন আভায় সম্ভাবনার দ্বারে।

সত্য-ন্যায়ের পথ হেঁটে যাও মানবতার পক্ষে
অপরাধীর করতে বিচার লড়ো দৃঢ় লক্ষ্যে ।
একাত্তর আর পঁচাত্তরের সব খুনিদের রায়ে
নতুন দিনের জাগরণে লাগল হাওয়া নায়ে ।
এই বিচারে বীর বাঙালির বাড়ল চলার গতি,
বিশ্ব বিবেক জানায় সালাম দেশরত্নের প্রতি।

দুঃস্বপ্ন আর দুঃশাসনের ভয়-ভীতি সন্ত্রাসে;
সাহস বুকে সাহসিকা গভীর তিমির নাশে ।
তোমার অমন বিষণ্ন এ শোকের ছবি দেখে
পথ হারানো পথের কবি এই কবিতা লেখে ।
সন্তাপেরই দাহে জ্বলে দুর্ভাগা এক রাহী;
শোকের বসন জড়িয়ে গায়ে পিতার গান গাহি ।

একুশে আগস্ট ছুঁড়ল গ্রেনেড মারল মানুষ কারা?
একাত্তর আর পঁচাত্তরের জালিম জল্লাদ তারা ।
দুঃসহ দুর্গতির কালে আল্লাহ মেহেরবানে,
তোমার মৃত্যু রুখে দিয়েছে জাগ্রত উদ্যানে।
অশ্রুসজল দুর্ভাবনায়, আর কেঁদো না মাগো,
বীর জননীর প্রাণের আলোয় বীর বাঙালি জাগো ।

তুমি এখন বিশ্ব গর্ব সফল সমাধানে
তুমিই পারো শক্তি দিতে বীর জনতার প্রাণে ।
জাতির পিতা বঙ্গমাতা মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ
ত্যাগের বিরল প্রজ্ঞাগুণে অনন্ত উত্থান।
জাতির পিতা বঙ্গমাতার নির্মম শোকগাথা
ইতিহাসে থাকবে লেখা তাদের কীর্তিগাথা।

তোমার নির্দেশ

আ. শ. ম. বাবর আলী

বঙ্গবন্ধু, যে দেশ তুমি
আমাদেরকে দিলে,
সে দেশটাকে গড়ছি যে আজ
আমরা সবাই মিলে।

গড়তে এদেশ দিয়েছিলে
তুমি নির্দেশ তাই,
বঙ্গবন্ধু তোমার নির্দেশ
আমরা ভুলি নাই।

তোমার নির্দেশ বঙ্গবন্ধু
আমরা ভুলিনি তো,
তোমার সোনার বাংলা গড়তে
আমরা নিয়োজিত।

জাতির পিতার দেশ

বাবুল তালুকদার

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল দেশের জন্য অনেক
আদর্শ ও নীতি নিয়ে বেঁচে থাকল ক্ষণেক
দেশের মানুষ কাঁদে আজও জাতির পিতার জন্য
স্বাধীনতার আলো দিলো আমরা জানাই ধন্য।

স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নত দেশ হবে
মানবজাতির অন্তরে যে সুখ শান্তি রবে
ভালোবেসে মানুষকে সে অন্তরে ঠাঁই দেয়
কুচক্রিরা সুযোগ খুঁজে প্রাণ কেড়ে নেয়।

লোভ লালসার চক্রে পড়ে অমানুষের দল
সুখ-শান্তি নষ্ট করে চোখ করে ছলছল
হত্যা শেষে পালিয়ে বেড়ায় বিশ্ববাসীর মাঝে
অপরাধের পাহাড় গড়ে পড়ল সর্বনাশে।

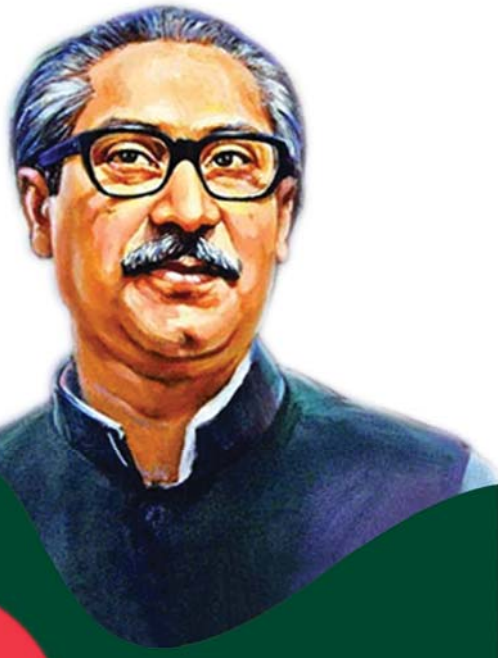

গল্প

বঙ্গবন্ধু ও সাপে কাটা আবদুল হাই

আহমেদ রিয়াজ

সারা রাত বিছানায় কেবল এপাশ-ওপাশ করেছে বাবলু। কিন্তু ঘুম হয়নি। ছটফট করতে করতেই রাত শেষ। এর আগে কোনো রাতে ঘুমুতে গিয়ে এতটা ছটফট করেছে বলে মনে পড়ছে না।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় বাবলু। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই রাতের অন্ধকার কেটে গেল। সূর্য ওঠার আগেই আলোময় হয়ে উঠল চারপাশ। হঠাৎ কে যেন জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি মারল।

হাঁক দিলো বাবলু, 'কে?'

'আমি রঞ্জু। দরজা খোল।'

বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলল বাবলু। অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'এত ভোরে!'

রঞ্জু বলল, 'আর বলিস না। রাতে ঘুম হয়নি। আমাদের এলাকায় বঙ্গবন্ধু আসবেন, এই উত্তেজনায় কি ঘুম হয়?'

বাবলু বলল, 'আমিও সারারাত ছটফট করেছি! এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি। নাশতা খেয়ে বেরিয়েছিস তো?'

'না।'

'তাহলে চল, নাশতা করে বেরিয়ে পড়ি।'

পান্তা খেয়ে নৌকায় উঠল দুই বন্ধু। নৌকা বেয়ে চলে এল সোজা ওয়াপদা বাঁধের একটা জায়গায়। জায়গাটার নাম চালা। মঞ্চটা এখানেই বানানো হয়েছে।

১৯৭০ সালের আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর। সিরাজগঞ্জের বেলকুচি ও চৌহালী থানার বন্যা নিজের চোখে দেখার জন্য আসছেন বঙ্গবন্ধু।

বেলকুচি আর চৌহালীর গ্রামে গ্রামে ব্যাপক প্রচারণা চলল কয়েকদিন। মাইকিং হলো। দুই থানার মানুষের চোখেও ঘুম নেই। কী করে থাকবে? চোখ বুজলেই যে চোখের সামনে বঙ্গবন্ধু এসে হাজির হয়ে যান!

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যখন বন্দি ছিলেন বঙ্গবন্ধু, তাঁর মুক্তির জন্য কত দোয়া-দরূদ পড়েছে সবাই। মাজারে মানত করেছে। পীরের দরগায় শিরনি দিয়েছে। দেবীর পায়ে প্রসাদ দিয়েছে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে বাংলার মানুষের কাছে ফিরে এসেছেন তাঁদের স্বপ্নপুরুষ, মুক্তির কাণ্ডারি। সে-ই মানুষ এই এলাকায় আসছেন! এমন মানুষকে নিজের চোখে দেখার উত্তেজনা তো আর কম নয়!

প্রথমে খবর ছিল বঙ্গবন্ধু আসবেন লঞ্চে করে। পরে নতুন খবর পাওয়া গেল লঞ্চে করে নয়, সিরাজগঞ্জ সদর থেকে ওয়াপদা বাঁধ দিয়ে আসবেন বঙ্গবন্ধু। সড়ক পথে।

আসার কথা দশটায়। দশটা বাজতে আরো অনেক সময় বাকি! এর মধ্যেই সমাবেশের জায়গায় মানুষ আসতে শুরু করেছে। মঞ্চের চারপাশটা ভালো মতো দেখে নিল বাবলু আর রঞ্জু।

বাবলু জানতে চাইল, 'মঞ্চ ঠিক আছে রে রঞ্জু?'

খুব বড়ো নয় মঞ্চটা। আরো বড়ো করার সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। বন্যায় চারপাশ ডুবে আছে। এর মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর জন্য একটা মঞ্চ তো বানাতে পেরেছে!

রঞ্জু বলল, 'ঠিকই তো আছে! কিন্তু...'

বাবলুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মঞ্চ বানানোর কাজে তদারকিটা বাবলুই করেছে। কিন্তু শুনে ওর বুক তো ছ্যাঁৎ করবেই। জানতে চাইল, 'কিন্তু কী?'

'মঞ্চটা ছোটো। বঙ্গবন্ধু যত বড়ো নেতা, মঞ্চটা তত বড়ো নয়।'

বাবলু বলল, 'তাতে কী! যাঁর জন্য এই মঞ্চ, তিনি তো আর ছোটো নন। তিনি হিমালয়ের চেয়েও বড়ো। তিনি যখন এই মঞ্চে এসে দাঁড়াবেন, ছোটো মঞ্চটাও তখন বড়ো হয়ে যাবে। বিশাল বড়ো! দেখে নিস।'

বাবলুর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো রঞ্জু। কী বলবে বুঝতে পারল না। কথা খুঁজে না পেয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। মানুষে মানুষে ভরে যেতে লাগল ওয়াপদা বাঁধ।

বাঁধের উপর তখন বাঁধভাঙা মানুষের জোয়ার। হাজার হাজার মানুষ। পঁচিশ-তিরিশ হাজার তো হবেই।

ঘড়ির দিকে তাকালো বাবলু। দশটা তো পেরিয়ে গেছে! এই তো বঙ্গবন্ধু এসে যাবেন।

কিন্তু দশটা পেরিয়ে এগারোটা। তারপর যখন বারোটা বেজে গেল, ছটফট করতে লাগল বাবলু। এত দেরি করছেন কেন বঙ্গবন্ধু?

মঞ্চের চারপাশে এর মধ্যেই কয়েকবার চক্কর দিয়ে ফেলেছে ও। দেরি করছেন বঙ্গবন্ধু আর ছটফট করছে বাবলু। তবে কি বঙ্গবন্ধু আসবেন না? নাকি আসার সময় পাচ্ছেন না? কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো অমন নন। যত কষ্টই হোক, তিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন। কোনো

অঘটন ঘটে গেল না তো? পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে বিশ্বাস নেই। হয়ত দেখা গেল বঙ্গবন্ধু সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত ঠিকই এসেছেন। তারপর হঠাৎ তাঁকে গ্রেফতার করল। গ্রেফতার করতে এলে তো কিছুই করার নেই। পালিয়ে বেড়ানো নেতা নন তিনি। তিনি বঙ্গবন্ধু। বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য কতবার যে কারাগারকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন, তার কি হিসাব আছে? তবে কী...?

নাহ আর কিছু ভাবতে পারছে না বাবলু।

বারোটাও পেরিয়ে গেছে সেই কখন। তারপর একটা। দু'টা। তিনটা!

ওদিকে মানুষজনও তেতে উঠছে। সূর্যের উত্তাপ তো সারা বছরই থাকে। আগুনের হল্কায় সারা বছরই তো ওদের গা পোড়ে। চান্দি গরম হয়ে যায়। কিন্তু কই! কখনো তো কেউ তেতে ওঠে না। আজ কেন তেতে উঠছে?

এ সময়টায় দিন ছোটো হতে শুরু করে। মাঝ আকাশ থেকে গড়ান দিয়ে ততক্ষণে পশ্চিম আকাশে হেলান দিয়েছে হতচ্ছাড়া সূর্য। কিন্তু তেজ কমেনি। এত তেজোদীপ্ত সূর্য, কী হয় একদিন গড়াগড়ি না করে মাঝ আকাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলে!

সময় এখন কত হয়েছে কে জানে! ঘড়ির দিকে তাকাতেও সাহসে কুলাচ্ছে না বাবলুর। কী হবে ঘড়িতে সময় দেখে! ওর এখন বঙ্গবন্ধুকে চাই। ঘড়ির সময় নয়।

বিকেল চারটাও পেরিয়ে গেল। মানুষজন তখন উন্মাদ হয়ে গেছে। হাজার হাজার উন্মাদ মানুষ। ভাটা পড়েছে সূর্যের উত্তাপেও। আর কত! যে-কোনো সময় টুপ করে পশ্চিম আকাশে ডুব দেওয়ার জন্য সূর্যটা তৈরি হয়ে আছে। আর মানুষজন তৈরি হয়ে আছে বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখার জন্য। সূর্যের উত্তাপে সারাদিন ধরে তেতে ওঠা মানুষজনের তখনও উন্মাদনা কমেনি। তখনও সবাই আশায় আছে-বঙ্গবন্ধু আসবেন। নিশ্চয়ই আসবেন। না এসে পারেন না। কারণ তিনি যে 'বঙ্গবন্ধু'।

> **একটা হাসি দিলেন বঙ্গবন্ধু। কী মোহময় সে হাসি! মানুষের ভালোবাসার প্রতিদান তো কেবল ওই হাসিতেই দেওয়া যায়। মানুষ তাঁকে এতটাই ভালোবাসে–তাঁর মুখে হাসি দেখলেই ঠান্ডা হয়ে যায় সবার কলিজা।**

ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা তখন চারটা পেরিয়ে প্রায় পাঁচটা ছুঁই ছুঁই। তখন একটা জিপ এসে থামল জনসমাবেশে।

কে এলেন?

তিনি কি এলেন!

জিপের দরজা খুলতেই আসনে বসা মানুষটার দিকে আটকে গেল সবার চোখ। বঙ্গবন্ধু!

হঠাৎ শুরু হয়ে গেল শোরগোল। নেতিয়ে পড়া বিকেলটা যেন সতেজ হয়ে উঠল তাঁর আগমনে। শুরু হয়ে গেল উন্মাদনা।

জিপের কাছে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ছুটে গেল বাবলু। উন্মাদনায় যাতে কেউ কোনো দুর্ঘটনা ঘটানোর সুযোগ না পায়।

জিপ থেকে নামলেন বঙ্গবন্ধু।

বাবলু বলল, 'লিডার, আপনার আসবার কথা সকাল দশটায়। লোকজন ভোর থেকে অপেক্ষা করছে। এখন বিকাল শেষ। এত দেরি করে এলেন! অনেক লোক খুব রাগ করেছে।'

বঙ্গবন্ধু মুচকি হাসলেন। অসম্ভব রকমের আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'তুই থাম। আমি দেখছি।' মঞ্চে

উঠলেন বঙ্গবন্ধু। যেন এক সূর্যাস্তের আগে আগে আরেক সূর্যোদয় ঘটল ছোট্ট মঞ্চটায়। স্বাগত বক্তব্য রাখলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা সাইদুর রহমান। তারপর?

শুরু করলেন বঙ্গবন্ধু।

'ভাইসব! বাবলুর কাছে শুনলাম আপনারা আমার উপর রাগ করেছেন। আমার আসবার কথা বেলা দশটায়। এলাম বিকাল পাঁচটায়। স্বাভাবিকভাবেই আপনাদের রাগ হবার কথা। কিন্তু এই দেরির জন্য আমি দায়ী নই।'

বলেই একটু থামলেন। তেতে ওঠা মানুষদের দিকে তাকালেন। সবাই যে কখন ঠান্ডা হয়ে গেছে কেউ সেটা খেয়ালও করেনি। এখন আর কারো মধ্যে উন্মাদনা নেই। এখন সবাই মোহাচ্ছন্ন। মোহাচ্ছন্ন মানুষ তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাকিয়ে রইল বঙ্গবন্ধুর মুখের দিকে। আবার কখন মুখ খুলবেন তিনি!

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটু দম নিয়েই আবার শুরু করলেন বঙ্গবন্ধু।

'এখানে সকাল দশটার মধ্যে আসব বলে কাল সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছি। কিন্তু রাস্তার মধ্যে লোকজন আমার আসা যাবার খবর পেলে আমাকে থামায়, আমাকে দেখতে চায়, আমার কথা শুনতে চায়। তারা আমাকে ভালোবাসে। আপনারাই বলুন যারা আমাকে ভালোবাসে, তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে, তাদের সাথে দেখা না করে, দু'চারটি কথা না বলে চলে আসা কি ভালো? আপনারা কী বলেন?'

সঙ্গে সঙ্গে হাজারো কণ্ঠে জবাব ভেসে এল, 'না, না, না।'

একটা হাসি দিলেন বঙ্গবন্ধু। কী মোহময় সে হাসি! মানুষের ভালোবাসার প্রতিদান তো কেবল ওই হাসিতেই দেওয়া যায়। মানুষ তাঁকে এতটাই ভালোবাসে–তাঁর মুখে হাসি দেখলেই ঠান্ডা হয়ে যায় সবার কলিজা। শীতল হয়ে যায় উত্তপ্ত চান্দি। তবু জানতে চাইলেন বঙ্গবন্ধু, 'এরপরেও কি আমার উপর আপনাদের রাগ আছে?'

আবারও হাজারো কণ্ঠে একটি শব্দেরই প্রতিধ্বনি, 'না, না, না।'

আর এরপরই ভেসে এল বজ্রকণ্ঠ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপকর্মের হালখাতা তুলে ধরলেন বঙ্গবন্ধু। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরলেন পরম মমতায়। যেন ভাষণ নয়, মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল তাঁর মুখ দিয়ে। তিরিশ হাজার মানুষ সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। এতগুলো মানুষকে এক লহমায় আর কে কখন ঠান্ডা করতে পেরেছিল?

কিন্তু সেই মুগ্ধতা কাটতে না কাটতেই হঠাৎ শেষ হয়ে গেল ভাষণ।

বেলকুচির চালার অনুষ্ঠান শেষ করে চলে গেলেন বঙ্গবন্ধু। আর মোহাচ্ছন্ন মানুষ ফিরে যাচ্ছেন যার যার বাড়িতে। কিন্তু সবার কানে তখনও ভাসছিল প্রিয় নেতার কথাগুলো।

সঙ্গীদের নিয়ে বাবলুও ফিরতি পথ ধরল। হঠাৎ অনিল চন্দ্র পাল বললেন, 'বঙ্গবন্ধু এখন কোথায় যাবেন বাবলু?'

'পনেরো-বিশ মাইল দূরে চৌহালী থানার দিকে। দীঘলকান্দিতে।'

'ওখানেও ভাষণ দিবেন?'

'তা তো দিবেনই।'

অনিল চন্দ্র কবি মানুষ। কবিতা লেখেন আর রাজনীতি করেন। বাবলু আর অনিল একই গ্রামের মানুষ। গ্রামের নাম তামাই।

'এরপর বঙ্গবন্ধু কোথায় যাবেন?'

বাবলু বলল, 'শুনেছি দক্ষিণ দিকে দীঘলকান্দি স্থল পর্যন্ত যাবেন। চালা থেকে যেতে আসতে কমপক্ষে রাত একটা। এবং সিরাজগঞ্জ পৌঁছাতে রাত দুইটা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এত খবর নিচ্ছেন কেন?'

অনিল চন্দ্র যে তখনও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। তবে অন্ন-জলের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নয়। তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা তখন বঙ্গবন্ধু। আবদার জানালেন অনিল চন্দ্র, 'বাবলু, সারাদিন না খেয়ে, এত রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে থেকে এত কষ্ট করলাম। কিন্তু শেখ সাহেবকে তো ভালোভাবে দেখতে পেলাম না। তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথাও বলতে পারলাম না।

লোকজন তো সব চলে গেছে। এখন ভিড় নেই। আকাশে জোছনা আছে, আলো আছে। এত কষ্ট করলাম! আমার ইচ্ছা আরেকটু কষ্ট করি। ফেরার সময় তাঁকে একটু ভালোভাবে দেখি। সম্ভব হলে তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলি। বাড়ির এত কাছে আসছেন, এ সুযোগ আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না।'

বাবলুর বাকি সঙ্গীরাও তখন হইহই করে উঠল। আরে তাই তো! এ তো সবারই মনের কথা।

দলের সবার মুখের দিকে তাকালো বাবলু। গোলাম সারওয়ার, অনিল চন্দ্র পাল, নারায়ণ চন্দ্র বর্মন, ওসমান গণি সরকার, আনোয়ার হোসেন, সাবের হোসেন, জুলফিকার রফিক রঞ্জু...

ফিকে জোছনার আলোয় সবগুলো মুখ তখন উজ্জ্বল। বঙ্গবন্ধুর একটুখানি সান্নিধ্য পাওয়ার ইচ্ছায় উন্মুখ। বাবলু নিজেও।

সঙ্গে সঙ্গে সায় জানালো, 'তাহলে চলো।'

বাবলুর নেতৃত্বে দলটা হাজির হলো সুবর্ণ সারা নামের জায়গায়। এ পথ দিয়েই বঙ্গবন্ধু ফিরতি পথ ধরবেন!

চারদিকে পানি। বন্যার কারণে উঁচু জায়গাতে ধান, খড়, গরু-বাছুর রেখেছে মানুষজন। তেমনি একটা খড়ের গাদায় অপেক্ষা করছে সবাই। চারদিক ফকফকা। জোছনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কখন যে রাত দুটো বেজে গেছে, সে খেয়ালও নেই কারো। হঠাৎ একটা শব্দ পেল বাবলু। আরে! শব্দটা তো দক্ষিণ দিক থেকেই আসছে।

খড়ের গাদার উপর উঠল বাবলু। তাকালো দক্ষিণ দিকে। যা ভেবেছিল, ঠিক তাই! গাড়ির হেডলাইটের আলো আসছে। চিৎকার করে উঠল বাবলু, 'ওই যে লিডার আসছেন! দূরে গাড়ির লাইট দেখা যাচ্ছে।'

গাড়ির হেডলাইটের আলো কাছাকাছি আসতেই খড়ের গাদার উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেল বাবলু। আর ঠিক তখুনি একটা আর্তচিৎকার শোনা গেল, 'ও মারে মরলাম'!

আর্তচিৎকার করেই জ্ঞান হারিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল আবদুল হাই। বয়রা বাড়ির ছেলে আবদুল হাই। ক্লাস টেনে পড়ে। বাবলুর বন্ধু। ঘটনা কী?

খড়ের গাদায় হাত দিতেই লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত সাপ ছোবল মেরেছে।

বাবলুর গায়ে তখন দামি একটা শার্ট। যদিও পাঁচ টাকাতেই ভালো শার্ট পাওয়া যায়, তবে ১৪ টাকা দিয়ে ও শার্টটা বানিয়ে নিয়েছে বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষ্যে। সঙ্গে সঙ্গে গা থেকে শার্ট খুলে ফেলল বাবলু। ওই দামি শার্ট দিয়েই আবদুল হাইয়ের ছোবল মারা হাত কষে বেঁধে ফেলল।

আগেই হাত উঁচু করে গাড়ি থামানোর ইঙ্গিত করেছিল দলটি। জিপ ওদের পাশে এসে থেমে গেল। গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'ওরে পাগলের দল, কী সর্বনাশ! তোরা এখনও রয়েছিস?'

উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে বাবলু বলল, 'লিডার, তখন ভিড়ে আমাদের অনেকে আপনাকে ভালোভাবে দেখতে পারে নাই, একটু কথা বলতে পারে নাই। আপনাকে ভালোভাবে দেখার জন্য এখন পর্যন্ত আছি। কিন্তু এই মাত্র একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমার বন্ধু আবদুল হাইকে সাপে কেটেছে।'

বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা আবদুল হাইকে দেখালো বাবলু।

সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠলেন বঙ্গবন্ধু, 'কী বললি!'

তারপর ঝটপট গাড়ি থেকে নেমে আবদুল হাইয়ের কাছে ছুটে গেলেন।

গাড়ির ভিতরে তখন আরো কয়েকজন নেতা ছিলেন। কোরবান আলী, আবদুল মোমেন তালুকদার, আনোয়ার হোসেন রতু, আমির হোসেন ভুলু।

বঙ্গবন্ধু বললেন, 'ওকে জিপে উঠা। আমি নিয়ে যাব।'

গাড়ির ভিতর থেকে এক নেতা আপত্তি জানালেন, 'লিডার, এত রাতে এই ভেজাল গাড়িতে উঠায়েন না। ওকে এখানেই রেখে যান। কোনো লোকাল ট্রিটমেন্ট ওরা করাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে খেপে গেলেন বঙ্গবন্ধু। জিপের চালকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ড্রাইভার ভাই, তুমি আমার সিটে এই ছেলেকে নিয়ে যাও এবং সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে ওকে ভর্তি করে দিবে। আমি এদের সাথে

যাব না। আমি এখানেই ওদের সাথে থাকব। যদি সম্ভব হয় কাল সকাল আটটার মধ্যে এসে আমাকে নিয়ে যাবা। তা না হলে এরা আমাকে যেভাবে পাঠায় আমি সেইভাবে যাব।'

তারপর কাউকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ দিলেন না। ওয়াপদা বাঁধ থেকে দ্রুত পায়ে নিচে নেমে গেলেন।

পূর্ব দিকে তখন থই থই পানি। বন্যার পানি। সেই পানিতে তখন লুটোপুটি খেলছিল জোছনার আলো। বানের পানিতে চিকচিকে জোছনার লুটোপুটি দেখতে লাগলেন বঙ্গবন্ধু।

এদিকে কারো মুখে কথা নেই। সবাই যে যার জায়গায় স্থির হয়ে আছে। পাঁচ-ছয় মিনিট পর বাবলু এগিয়ে গেল বঙ্গবন্ধুর কাছে। তাঁর হাত ধরে বলল, 'লিডার চলেন। আপনি গাড়িতে উঠেন। দেখি আমরা কী করতে পারি।'

কিছু বললেন না বঙ্গবন্ধু। সোজা গাড়িতে উঠে নিজের আসনে বসলেন। তারপর বললেন, 'ওকে আমার কোলে বসিয়ে দে।'

সর্পদংশনে অজ্ঞান আঠারো বছর বয়সি আবদুল হাইকে ধরাধরি করে বঙ্গবন্ধুর কোলে শুইয়ে দিলো বাবলুরা।

গাড়ির দরজা বন্ধ করার আগে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'বাবলু, তুই গাড়ির পিছনে উঠ।'

বাবলু আপত্তি জানালো, 'না লিডার। আমি যাব না।'

ধমক দিয়ে উঠলেন বঙ্গবন্ধু, 'তুই আমার কথা অমান্য করতে সাহস পাস!'

এবার কৈফিয়ত দিলো বাবলু, 'লিডার, দেখছেন না আমি খালি গায়ে। আমার গায়ের গেঞ্জি ও শার্ট দিয়ে ওর হাত বেঁধে দিয়েছি। এখন ওর বাঁধন খুললে ও নিশ্চিত মারা যাবে। খালি গায়ে শহরে যাওয়া যায়?'

বাবলুর যুক্তির কাছে হার মানলেন বঙ্গবন্ধু। নরম সুরে বললেন, 'ওহ-তাই তো!'

এবার মায়ের মামা ওসমান গণিকে দেখিয়ে বাবলু বলল, 'উনি আমার নানা। ওনাকে নিয়ে যান।'

ওসমান গণিকে গাড়িতে উঠিয়ে রওনা দিলেন বঙ্গবন্ধু।

ওখান থেকে সিরাজগঞ্জ বিশ মাইল। রাস্তাটা খুব দীর্ঘ নয়। কিন্তু কাঁচা একটা রাস্তা, তা-ও আবার অসমান। উঁচুনিচু। এ রাস্তায় জিপ নিয়ে চলাচল সহজ কথা নয়। গাড়ির ভিতর এ ওর গায়ে ধাক্কা লাগে। যখন তখন গাড়ির ছাদে মাথা ঠুকে যায়। এমন বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে বন্ধুর মতো হাজির হয়েছেন বঙ্গবন্ধু। উচ্চারণ করেছেন মুক্তির বাণী। সকাল-দুপুর-বিকেল পুরোটা সময় এক টুকরো খাবার তো দূরের কথা, এক ফোঁটা পানিতেও গলা ভেজাতে পারেননি। এখন আবার তাঁর কোলের উপর অজ্ঞান আস্ত এক জোয়ান ছেলে। দুর্বিসহ সে রাস্তা পাড়ি দিতে সময় লাগল দেড় ঘণ্টা!

রাত সাড়ে তিনটায় অজ্ঞান আবদুল হাইকে নিয়ে সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে ঢুকলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু এ কী! হাসপাতালে কোনো ডাক্তার নেই। ডাক্তাররা সব বাসায়।

হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার সিরাজুল হক চুনু। সিরাজগঞ্জ শহরেই তাঁর বাসা। আবদুল হাইকে হাসপাতালে রেখে জিপ নিয়ে প্রধান ডাক্তারের বাসায় ছুটলেন বঙ্গবন্ধু। ডাক্তারকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। ভোররাতে নিজের বাসায় বঙ্গবন্ধুকে দেখে ডাক্তার তো অবাক! কোনো রকমে ঢোক গিলে জানতে চাইলেন, 'বঙ্গবন্ধু, আপনি! এত রাতে! আমার বাসায়!'

বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কথা বলার সময় নাই। জলদি চলেন। হাসপাতালে এক অজ্ঞান রোগী রেখে এসেছি। চিকিৎসা করাতে হবে।'

তারপর ডাক্তারকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন হাসপাতালে।

কিন্তু হাসপাতালে এসে দেখা গেল, সাপে কাটার ইনজেকশন নেই।

ইনজেকশন নেই! তাই বলে হতাশ হয়ে চুপ করে বসে থাকার মানুষ নন বঙ্গবন্ধু। জানতে চাইলেন, 'সিরাজগঞ্জের কোথাও নেই?'

ডাক্তার বললেন, 'দোকানে আছে।'

'কোথায় দোকান?'

দোকানের অবস্থান জেনে আবার ছুটলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু এ কী! দোকানও তো বন্ধ। যদিও শেষ রাতে ওষুধের দোকান খোলা থাকার কথা নয়। বন্ধ দোকানে আবার তালা মারা। মানে দোকানের ভিতরেও কেউ নেই। থাকলে না হয় ডেকে তোলা যেত। এখন উপায়?

পাশের দোকানের দিকে তাকালেন বঙ্গবন্ধু। পাশের দোকান বন্ধ কিন্তু বাইরে থেকে তালা মারা নেই। ভিতরে লোকজন আছে।

পাশের দোকানের ভিতরে থাকা মানুষদের জাগিয়ে তুললেন। তাদের কাছ থেকেই জেনে নিলেন ওষুধের দোকানদারের ঠিকানা। ঠিকানা খুঁজে বের করতে দেরি হবে, সে কারণেই তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলেন ওষুধের দোকানদারের বাড়িতে। কিছুক্ষণ বাদেই বাড়ি থেকে ওষুধের দোকানদারকে তুলে আনলেন। তারপর দুশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দুটো ইনজেকশন কিনে ছুটে এলেন হাসপাতালে।

আবদুল হাইকে ইনজেকশন দিলেন ডাক্তার। কিছুক্ষণ পর আবদুল হাইয়ের জ্ঞান ফিরল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বঙ্গবন্ধু।

ঝামেলাটাকে গ্রামের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ফেলে না রেখে, হাসপাতালে এনে চিকিৎসা করিয়ে বরং সবাইকেই ঝামেলামুক্ত করলেন বঙ্গবন্ধু।

এতক্ষণ তাঁকে বিশ্রামের অনুরোধ করারও সাহস হয়নি কারো। আবদুল মোমেন তালুকদার বললেন, 'লিডার, এবার তো বিশ্রাম নিতে আপত্তি নেই?'

মুখে কিছু বললেন না বঙ্গবন্ধু। চোখের ভাষাতেই জানিয়ে দিলেন, এবার বিশ্রাম নিতে আপত্তি নেই।

সিরাজগঞ্জ শহরেই আবদুল মোমেন তালুকদারের ভায়রা মফিজ তালুকদারের বাসা। সে বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নিলেন বঙ্গবন্ধু। তবে বেশি সময়ের জন্য নয়। কিছুক্ষণ পরেই সকাল নয়টার ট্রেন ধরে রওনা দিলেন ঢাকার উদ্দেশে।

তাঁর যে অনেক কাজ! তাঁর কি বিশ্রাম নেওয়া মানায়! ❑

শিশুসাহিত্যিক

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

মাসুদ সিদ্দিকী

নদীমাতৃক একটি দেশ আমাদের এই অপরূপ বাংলাদেশ। তার একটি সুন্দর নদী মধুমতি। শান্ত মধুমতির একটি শাখা বাইগার নদী। এই মায়াবী বাইগার নদীর তীরবর্তী পাখি ডাকা, হিজলের পল্লবে ছায়া সুনিবিড়, নিঃশব্দ গ্রাম টুঙ্গিপাড়া।

এই রূপসী গ্রামের শিক্ষানুরাগী শেখ লুৎফর রহমান ও স্নেহময়ী মহীয়সী গৃহিণী সায়রা খাতুনের সংসার আলো করে একটি শিশুর জন্ম হয় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। বয়ে যাওয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে, পাখির বাসায় ডিম খুঁজে, মেঠো পথে বর্ষার তুমুল বৃষ্টিতে ফুটবল খেলে শিশুটি বড়ো হয়ে ওঠে।

এই মায়াবী শিশুর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং জাতির পিতা। সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক মহলে আলোচিত ও স্মরণীয় এমন বর্ণাঢ্য, ঘটনাবহুল রাজনীতিবিদ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। তাঁর জীবন কাহিনি হচ্ছে অন্যায় ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আপোশহীন সংগ্রামের কাহিনি। এদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অসীম ত্যাগ ও আমরণ উদ্যোগের একটি কাহিনি। আজ সারা পৃথিবীর মানুষ জানে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাগল বাঙালির সামনে দাঁড়িয়ে মাত্র আঠারো মিনিটের একটি ভাষণে তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নিয়তি নির্ধারণ করে দেন।

গোপালগঞ্জ থেকে ১৯৪২ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া (বর্তমানে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ) কলেজ থেকে আইএ, ১৯৪৭ সালে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। কলকাতায় পড়ার সময় রাজনীতিতে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হন। তরুণ বয়স থেকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্নেহধন্য হন। ১৯৪৬ সনে ভয়াবহ দাঙ্গার সময় হিন্দু- মুসলমানদেরকে সমভাবে সাহায্য করেন। আর ৫০-এর দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানা খুলে অনাহারী মানুষের পাশে এসে অন্ন দেন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এক রাজনৈতিক নেতা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সকল ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। রাজধানী হওয়া দরকার ছিল ঢাকায়। তা না করে হয় করাচিতে। পরে ইসলামাবাদে। নৌবাহিনীর সদর দপ্তর হতে পারতো চট্টগ্রামে। কিন্তু তা করা হয় করাচিতে। সামরিক- বেসামরিক পদে ছিল তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য। শিল্পোন্নতির সিংহভাগ অর্থ বিনিয়োগ হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। নিম্নভূমি পূর্ব পাকিস্তান যেমন কৃষিসর্বস্ব ছিল তেমনই রয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা যদিও বেশি তবু তাদের বাসভূমি যেন একটা উপনিবেশ। সেখানে অবাঙালি পাকিস্তানিদের শোষণ ও শাসন। বাংলার স্বায়ত্তশাসনের সূত্রে বঙ্গবন্ধু তুলে ধরেন তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা। আইয়ুব খান তার জবাব দিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে। এতে বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ হলো। ছয় দফার পক্ষে কাজ করতে গিয়ে এমন জায়গা নেই যেখানে তিনি গ্রেপ্তার হননি। তবুও বঙ্গবন্ধু ভীত হননি। পাকিস্তানের কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে তিনি হিমালয়ের উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। ছাত্র- জনতার বাঁধার মুখে সামরিক শাসক আইয়ুব খান বিদায় নেন। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির একমাত্র স্বার্থরক্ষক ও বন্ধু হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় অভিষিক্ত হন।

ইয়াহিয়া খান আইয়ুব খানের মতো মেধাবী ছিলেন না। তার মতো রাজনীতি বুঝতেন না। তিনি ভুট্টোকে দাবিয়ে রাখার পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুকে দাবিয়ে রাখা সহজ মনে করেন। তাঁর ধারণা ছিল না শান্ত ও নিরস্ত্র বাঙালি কী করে যোদ্ধা জাতি পাঠান ও পাঞ্জাবির মুখোমুখি হতে পারে। তিনি বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যান। যাবার আগে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে (১২টা ২০ মিনিট) বঙ্গবন্ধু ইপিআরের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুতরাং শোষণমুক্তি ও শাসনমুক্তির জন্য যেটা করতে হলো তার অন্য নাম মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ যার আরম্ভ, আর ১৬ই ডিসেম্বর যুদ্ধরত ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে তার সমাপ্তি। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও প্রেরণা ছিল সর্বক্ষণ। ইয়াহিয়ার পতনের পর ক্ষমতায় আসেন ভুট্টো। তিনি আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন। ১০ই

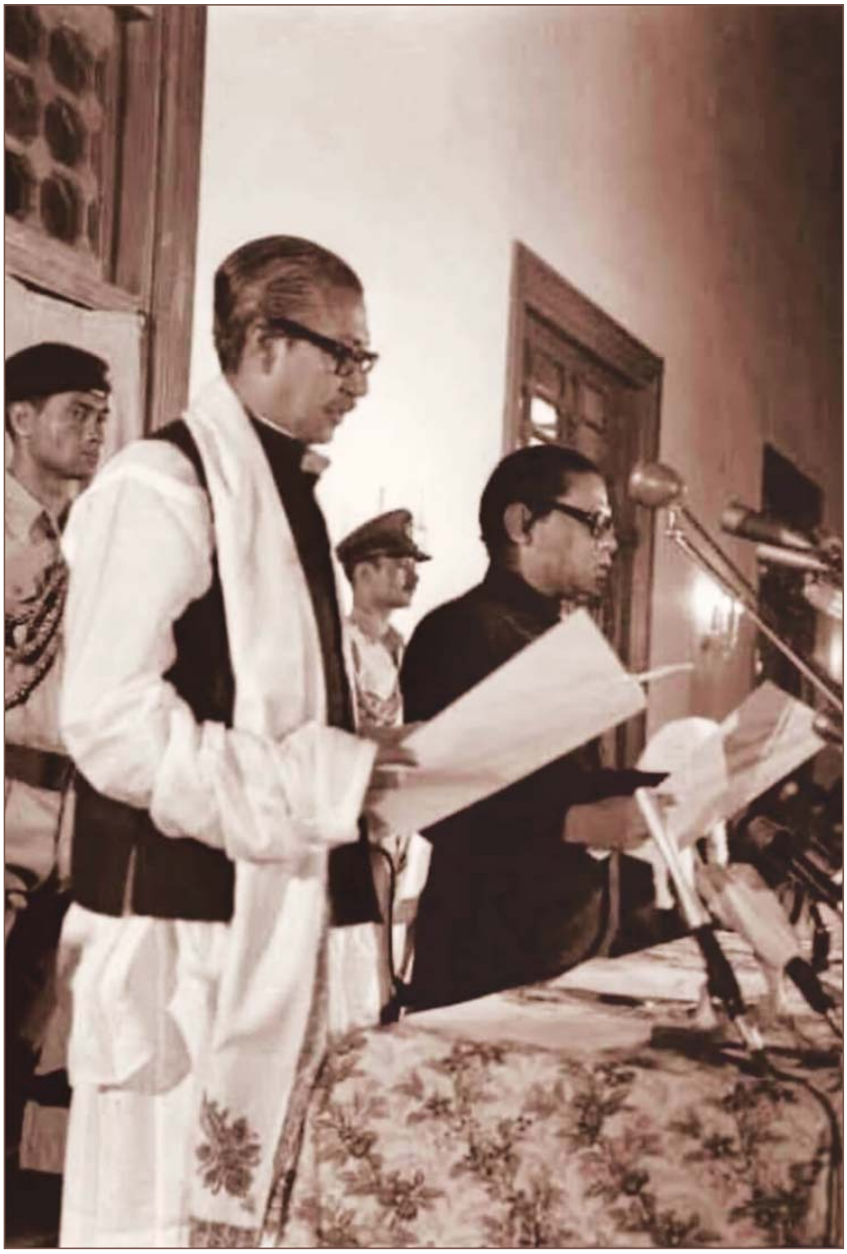

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১২ই জানুয়ারি, ১৯৭২

জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় সোনার বাংলায় ফিরে এলেন। মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হলেন। তিনি বাংলাদেশের লাল- সবুজ পতাকার লাল সূর্যটির দিকে তাকিয়ে দেখেন সে পতাকাটি আঁকা হয়েছে অগণিত বীরের রক্তস্রোত ও মাতার অশ্রুধারা দিয়ে।

দেশে ফিরে এসে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দরিদ্র দেশের নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন তিনি। একটি প্রাদেশিক সরকারের কাঠামোর উপর একটি সার্বভৌম জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। কিন্তু সময়টি আর আগের মতো ছিল না।

বঙ্গবন্ধুর কাছে মানুষের প্রত্যাশা ছিল আকাশচুম্বী। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, ধ্বংসপ্রাপ্ত সব ধরনের অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, ঘাতক-দালালদের বিচার, পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, আইন- শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, বিশ্বসমাজের স্বীকৃতি আদায়, নির্যাতিত ও পরিত্যক্ত নারীদের পুনর্বাসন, জ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার, কোষাগার সচল, দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা, নতুন দেশের বিরুদ্ধে দেশি- বিদেশি ষড়যন্ত্র মোকাবিলা এ রকম অসংখ্য প্রতিকূলতার মাঝে তিনি কাজ শুরু করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তিনি বাঙালি জাতিকে একটি অনুপম সংবিধান উপহার দেন। যার উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ হয়েছে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তাঁর আরেকটি কীর্তি সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়। বঙ্গবন্ধু সরকারের অসাধারণ কৃতিত্বের কয়েকটি হলো:

১. বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদাকে প্রধান করে শিক্ষা কমিশন গঠন

২. সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ। ৩.২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ

৪. বিদেশি মালিকানার গ্যাস ফিল্ডসহ শিল্প প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ

৫. দেশকে শত্রুমুক্ত করার তিন মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনী প্রত্যাহার। ১৯৭২ সালের ১২ই মার্চ ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে

৬. দেড় বছরে এক কোটি শরণার্থী ও বাস্তহারাদের পুর্নবাসন সম্পন্ন করা

৭. বিচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায়।

১৯৭৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু নিউইয়র্কে যান। জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ দেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিশাল হৃদয়ের উষ্ণতা সবসময় সকলকে আকর্ষণ করত। এই বিরল গুণের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ত্রো, প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, প্রেসিডেন্ট বুমেদিয়েন, প্রেসিডেন্ট ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কসিগিন, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, মান্যবর শেখ জায়েদসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত বন্ধুতে পরিণত হন। বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের মূল্যায়ন করেছেন প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়। সাবেক এই আইসিএস কর্মকর্তা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলা দু'জায়গাই কাজ করেছেন। তিনি বলেন, 'ইতিহাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিন থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনাবসান পর্যন্ত সময়টি ছিল একটি স্বর্ণযুগ' ।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের শ্রাবণের শেষরাত পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে নির্মম হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শাহাদত বরণ করেন। দুধের শিশু থেকে মেহেদি হাতে নববিবাহিতা বধূ কিংবা অন্তঃসত্ত্বা নারী কেউ রক্ষা পায়নি তাদের হাত ধরে। জাতির পিতার বুক ছিল ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের মতো বিশাল। সেই বুক বিদ্ধ হলো দেশদ্রোহী ঘাতকদের বুলেটে। বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান, লাল- সবুজের পতাকা, ইতিহাস, মূল্যবোধ, ভেসে গেল শহিদের রক্তের প্লাবনে। বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়ার শ্যামল মাটিতে শায়িত হলেন।

> "
> **দেশে ফিরে এসে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দরিদ্র দেশের নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন তিনি। একটি প্রাদেশিক সরকারের কাঠামোর উপর একটি সার্বভৌম জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। কিন্তু সময়টি আর আগের মতো ছিল না।**

কিন্তু ঘাতকরা জানতো না যে এ দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ও আদর্শ হলো ঘাতকের গুলির চেয়েও শক্তিশালী। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মঙ্গল সাধন। বাঙালির কল্যাণের জন্য তাঁর নিবেদন ও দরদ ছিল কিংবদন্তির মতো। সে কারণে তাঁর মহান মৃত্যু ও আত্মত্যাগ আমাদেরকে হৃদয়কে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

তিনি মিশে আছেন তাঁর প্রিয় সোনার বাংলার জল, মাটি ও হাওয়ায়। জাতীয় শোকের এই মাসে কে ভুলতে পারে কবির সেই অবিনাশী উচ্চারণের কথা– 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা/ গৌরী মেঘনা বহমান / ততকাল রবে কীর্তি তোমার/ শেখ মুজিবুর রহমান/ দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা/ রক্ত গঙ্গা বহমান/ তবু নাই ভয় হবে হবে জয়/ জয় মুজিবুর রহমান।' ❑

প্রাবন্ধিক ও সাবেক সচিব

প্রতিধ্বনি

মনি হায়দার

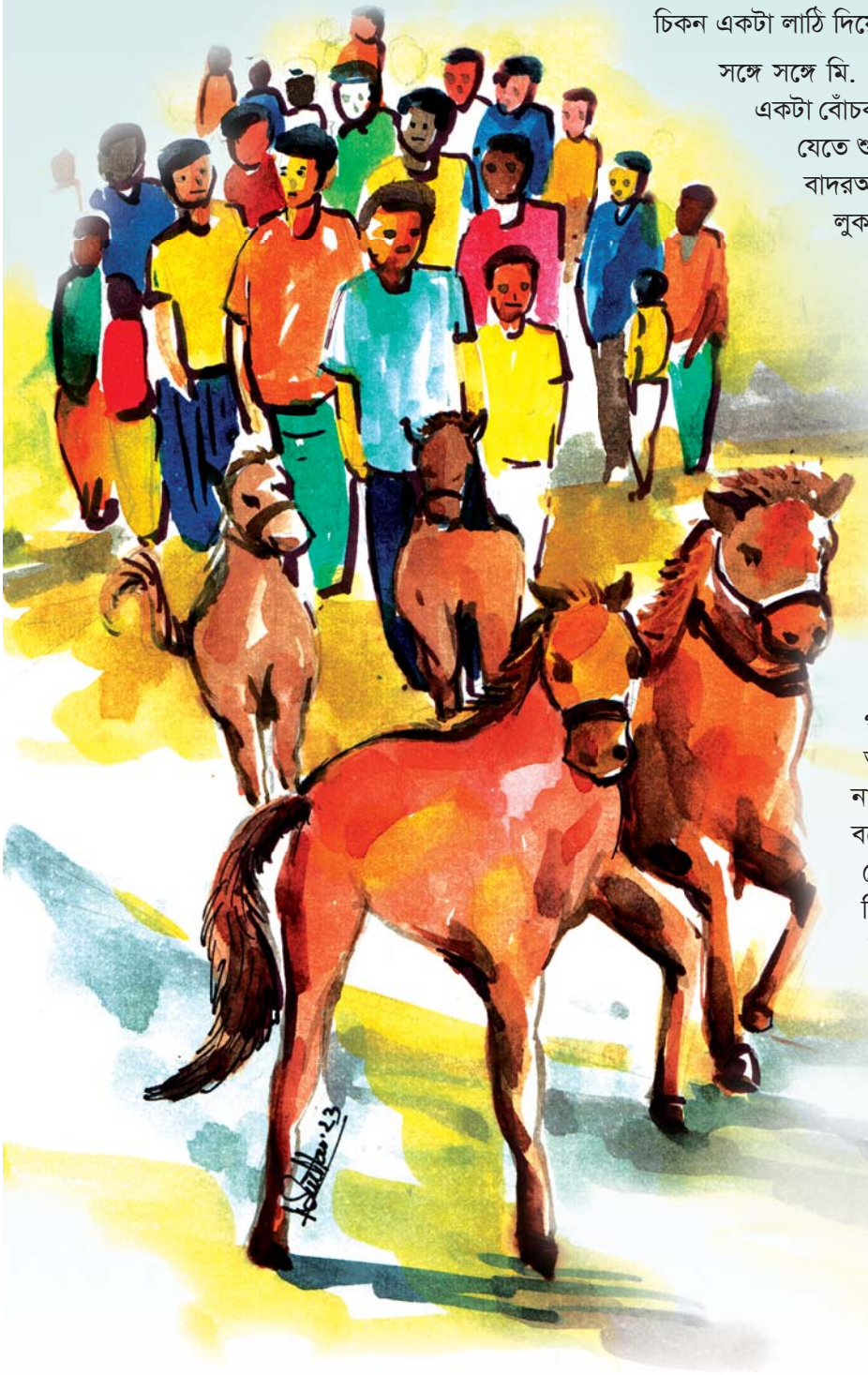

দ্যাখেন ভাই দ্যাখেন, বান্দরের খেলা দ্যাখেন...। আমার ডাইন আতে যে বান্দরটা দ্যাখতেছেন, ওর নাম সোহাগী। আর বাম আতের বান্দরের নাম মি.মোখলেস। এই মোখলেস সাহেব এহন আপনাগো সামনে দিয়া শ্বশুরবাড়ি যাইবে... বলেই লোকটা মি.মোখলেস বাদরের পিঠের উপর হালকা বাড়ি দেয় চিকন একটা লাঠি দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে মি. মোখলেস বাদরটি পাশে রাখা একটা বোঁচকা মাথায় নিয়ে সোহাগীর দিকে যেতে শুরু করে। সোহাগী ওকে দেখে বাদরঅলা লোকটার আড়ালে মুখ লুকায়। উপস্থিত প্রায় শ'দেড়েক লোক তালিতে ফেটে পড়ে। সেই শ'দেড়েক লোকের সঙ্গে উজানগাওয়ের বৈশাখি মেলায় বাদরের খেলা দেখছে গগন।

গগন মেলায় এসেছে বড়ো মামার সঙ্গে। ওদের বাড়ি কুমারখালী গ্রামে। মামার বাড়ি উজানগাও গ্রামে। গগনদের গ্রামের আশেপাশে কোনো মেলা-টেলা হয় না। মেলার কত গল্প শোনে স্কুলের বন্ধু বৈকালী আর সাগরের মুখে। ওদের নানাবাড়ি পাঙ্খাপুরে অনেক বড়ো মেলা হয়। মেলায় হাতি-ঘোড়া আসে। কত মানুষ। জিলাপি, রসগোল্লা, দানাদার, বাতাসা খাওয়া যায়। সেইসব শুনে গগনেরও খুব ইচ্ছে মেলা দেখার। কিন্তু গ্রামের বাড়ি থেকে কে নিয়ে আসবে মামাবাড়ি? গত বছর নানিবুয়ার কাছে গগন বায়না ধরেছিল, আমাকে তোমাদের মেলা দেখাবে?

আমি কখনো মেলা দেখিনি?

আহারে আমার নানু! নানিবুয়া গালে আদর করে বলেছিল, ঠিক আছে নানাভাই। আমি তোমাকে মেলা দেখাবো। নানিবুয়া কথা রেখেছেন। মেলার দু-দিন আগে বড়ো মামা এসে হাজির। বলে, তোকে নেওয়ার জন্য মা পাঠিয়ে দিলেন। চল।

গগনকে আর পায় কে? বড়ো মামার সঙ্গে মামার বাড়ি। মামার বাড়ি আসার পর ঘুরেফিরে একটাই প্রশ্ন, মেলা কোথায় হবে নানিবুয়া?

ওই তো বাঙালি নদী পার হয়ে যে মাঠ, সেই মাঠে।

কখন হবে?

নানিবুয়া, বড়ো মামা লকেট মিয়া হাসে গগনের ছেলেমানুষিতে। নানিবুয়া গগনকে আদর করে বলেন, আজ বাদে কাল বিকেলে হবে মেলা।

আরও একদিন পর? তর সইছে না গগনের। পারলে আজই, এখনই উড়ে যায় মেলায়। অনেক অপেক্ষার পর সেই মেলায় এসেছে গগন। এসেই যা দেখে, ওর কাছে দারুণ লাগে। লকেট মামার হাত ধরে গগন মেলার কিনারে, উঁচু রাস্তার উপর দাঁড়ায়। অনেক লোক দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। গগনও তাকায়। কিচ্ছু দেখতে পায় না। লকেট মামাকে জিজ্ঞেস করে, মামা? ওইদিকে সবাই তাকিয়ে আছে কেন?

ঘোড়ার দৌড় হবে।

ঘোড়ার দৌড়? ঘোড়া কই? গগন দিশেহারা। বইয়ের ছবিতে দেখেছে ঘোড়ার টকটকে ছবি। সেই ছবির ঘোড়া দেখবে আজ? হঠাৎ দূরে, দেখতে পায় কয়েকটা বিন্দুর মতো এদিকে আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গগন দেখতে পেলো, ধুলো উড়িয়ে চার চারটে ঘোড়া ছুটে আসছে ওদের দিকে। ভয়ে, উত্তেজনায় গগন হাত ধরে বড়ো মামার। ঘোড়াগুলো দ্রুতবেগে ছুটে এসে রাস্তা থেকে একটু দূরে থামে। প্রত্যেক ঘোড়ার উপর একজন সওয়ার। কী সুন্দর ঘোড়া!

গগন?

মামা? চল, কেবল ঘোড়া দেখলেই হবে? ওদিকে আরও কত কী আছে, চল...মামা হাত ধরে টেনে জটলা থেকে বের হলে সামনেই পড়ল কয়েকটা জিলাপির দোকান। দোকানিরা জিলাপি ভাজছে।

কীরে! জিলাপি খাবি?

মাথা নাড়ায় গগন, খাবো।

দুজনে বসে যায় টুলে। দোকানদারকে বলে, দুই প্লেটে গরম গরম জিলাপি দাও আমাদের।

দোকানি দুই প্লেটে জিলাপি রেখে যায়। গগন মুখে দিতে গিয়ে গরম ছ্যাঁকা খায়। উঁহু...। মামা হাসে।

আস্তে খা।

গরম জিলাপি খাওয়ার পর বড়ো মামা আরও কত কিছু দেখিয়েছে গগনকে, গগন তো খুশিতে আশিখানা। স্কুলে গিয়ে বৈকালী আর সাগরকে বলা যাবে। বড়ো মামার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। দুজনে কথা বলছে। একটু দূরেই বানরের খেলা হচ্ছিল। হাত ধরে টানে গগন। মামা একটু বিরক্ত হয়ে গগনকে নিয়ে বানরের খেলার ভিড়ে দাঁড়ায়। বড়ো মামার সঙ্গে বন্ধুও আছে। গগন অবাক হয়ে বানরের খেলা দেখছে।

বানরের খেলার চেয়ে মাঝবয়সি লোকটা, মুখের উপর কাঁচাপাকা গোঁফ, হালকা-পাতলা শরীর, মাথায় প্রচুর এলো চুল, পরনে সস্তা লুঙ্গি, গায়ে একটা হলুদ রঙের পুরোনো ফতুয়া, ফতুয়াটা বাতাসে হালকা উড়ছে- এই লোকটাকেই বেশি আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে গগনের। এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, বড়ো হয়ে আমি বাদরঅলা হবো। আহ! লোকটার কথায় বানর দুটো সব করছে। লোকজন কেমন অবাক।

এইবারের খেলা দ্যাখবেন আপনারা আরও আজব। এই যে আমার হাতে একটা গোলাকার চক্র দ্যাখতাছেন, এই চক্রের মধ্যে দুই বান্দর দুই দিক দিয়া লাফ দেবে, কিন্তু কারো গায়ে গা লাগবে না...। রেডি, ওয়ান, টু, থিরি...। বানরঅলা বলার সঙ্গে সঙ্গে বানর দুটি দুই প্রান্ত থেকে লাফ দিতে শুরু করে। লোকটা মাঝ বরাবর ধরে রাখে লোহার রডের গোলাকার বৃত্ত। সবাই খুশিতে তালি দিচ্ছে, দিচ্ছে গগনও। তালি দিতে গিয়ে বায়ে তাকায়, অপরিচিত মুখ। ডানে তাকায়, অপরিচিত মুখ। সামনে তাকায়, আরও অপরিচিত মুখ।

হঠাৎ ভীড় ঠেলে বানরের খেলা থেকে বাইরে আসে গগন। না, বড়ো মামাকে কোথাও দেখতে পায় না। চারদিকে এত মানুষ! কোথায় বড়ো মামা? গলা ছেড়ে ডাক দেয় গগন, বড়ো মামা! ও বড়ো মা...মা...। মেলার লোকজন ওর দিকে অবাক চোখে তাকায়। ডাকাডাকি বন্ধ করে সামনের দিকে ছোটে। ছুটতে ছুটতে এসে হাজির একটা জিলাপির দোকানের সামনে। মেলায় ঢোকার সময় যে দোকানের গরম গরম জিলাপি খেয়েছিল গগন আর ওর বড়ো মামা লকেট মিয়া। যে লোকটা গভীর মনোযোগ দিয়ে জিলাপি ভাজছে, তার সামনে দাঁড়ায় গগন, আমার মামাকে দেখেছেন?

মামা?

ওই যে আমরা জিলাপি খেলাম...।

লোকটা গরম তেলের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিলাপির ময়ান ছাড়তে ছাড়তে বলে, বাবারে! কত লোকই তো আমাদের দোকানে বসে জিলাপি খায়। সবাইকে মনে রাখা যায়? তুমি তোমার মামাকে অন্যদিকে খোঁজো গিয়ে...। লোকটা মনোযোগ দিয়ে জিলাপির ময়ান ছাড়ছে। গগন কী আর করবে? চোখে ওর পানি এসে যায়।

বাড়ি ছেড়ে আসার সময় নানিবুয়া বার বার বলেছে, মেলায় যাচ্ছিস, যা। কিন্তু তোর বড়ো মামার হাতটা ছাড়বিনে। কত বড়ো মেলা, একবার হারিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে নানে।

নানিবুয়ার কথাই সত্যি হলো? আমি হারিয়ে গেছি? আর ফিরে যেতে পারব না! মাকে ছাড়া আমি থাকব কী করে? আমার ছোটো বোন বিন্নী কার সঙ্গে খেলবে? আচ্ছা, শুনেছি মেলায় ভূত আসে। সেইসব ভূতেরা যদি আমাকে পেয়ে যায়...। গগন আর ভাবতেই পারে না। মেলার এ মাথা থেকে ও মাথা ছুটছে, লোকজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ভাবছে, এই এখনই মামাকে পেয়ে যাবো। কিন্তু মামাকে কোথাও পায় না গগন।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে! ইতিমধ্যে মেলায় বাতি জ্বলে উঠেছে। এখন? এখন কী হবে? চট করে গগনের মনে হলো, মেলার এত মানুষের মধ্যে বড়ো মামাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক কাজ করি, আমি খেয়াঘাটে চলে যাই। খেয়াঘাটে যদি মামা অপেক্ষায় থাকে? যেই ভাবা, সেই কাজ। গগন ছুটল খেয়াঘাটের দিকে। তাও মেলা থেকে অনেক দূরে। সন্ধ্যার কালো অন্ধকার নেমে আসছে চারদিকে। মেলা থেকে বাইরে, খেয়াঘাটের দিকে যেতে যেতে পিছনে তাকায় গগন।

এমনও তো হতে পারে, বড়ো মামা লকেট মিয়া ওর জন্য মেলার বাইরে অপেক্ষা করছে! কিন্তু না, কোথাও বড়ো মামার চিহ্নটুকুও নেই। কোথায় গেল বড়ো মামা? কেবল দেখতে পায় দোকানগুলোর সামনের আলোর ঝলকানি। এত কষ্ট লাগছে গগনের...। চোখ ফেটে আবারও কান্না আসছে। কাঁদতে কাঁদতে গগন দৌড় শুরু করে খেয়াঘাটের দিকে।

আসার সময় মনে হয়েছিল খেয়াঘাট খুব কাছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, খেয়াঘাট অনেক দূরের। দৌড়াতে দৌড়াতে গগন পিছনে তাকায় যদি বড়ো মামা পিছন থেকে ডাক দেয়? না, কেউ নেই। একটা লোকও নেই পথে। আসবে কী করে? মাত্র তো সন্ধ্যা। মেলা ভাঙবে অনেক রাতে। গগন কাঁদে আর দৌড়ায় খেয়াঘাটের দিকে। দৌড়ে দৌড়ে গগন খেয়াঘাটে পৌঁছে হাঁপায়। হাঁপাতে হাঁপাতে মাটির উপর বসে পরে। একটু জিরিয়ে নিয়ে খেয়াঘাটের দিকে তাকিয়েই ওর মন খারাপ।

এই পারে খেয়া নেই। খেয়া ওই পারে বাঁধা একটা খুঁটির সঙ্গে। নদীটা খুব চওড়া নয়, আবার ছোটোও নয়। ভয় যেটা, নদীটায় ভয়ানক স্রোত। গগন অসহায় চোখে ওই পারের খেয়াটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কী করবে, কাকে ডাকবে, ভেবে উঠতে পারছে না।

মা গো! হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পরে গগন। খেয়াটা পার হতে পারলেই নানা বাড়ি যাওয়াটা তেমন কঠিন নয়। খেয়া পার হয়ে ওপারে উঠলেই একটা খোলা মাঠ, মাঠের পর বড়ো একটা রাস্তা, রাস্তার পরেই সোনাডাঙ্গা হাই স্কুল। সেই স্কুলের পিছনে কয়েকটা বাড়ির পরই মৃধা বাড়ি। রজব মৃধা বললেই সবাই চেনে। নানা বেঁচে নেই। মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। রজব নানা ওকে ভীষণ আদর করত। আজ যদি নানা বেঁচে থাকত, দেরি দেখে নিজেই নৌকা নিয়ে এপারে চলে আসত।

গগন দেখতে পায় একজন লোক নৌকায় উঠছে। কান্না ভুলে নৌকার দিকে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ দশাসই একজন মানুষ, নৌকা ছেড়ে দিয়ে এপারে আসছে বৈঠা বাইতে বাইতে। কে হতে পারে? পরিচিত কেউ? আরে না, এই মানুষটি হয়ত মেলায় যাবে। সেজন্য আসছে। কিন্তু মানুষটি মেলায় চলে গেলে আমাকে ওপারে নিয়ে যাবে কে? বিরাট নৌকা। বড়ো বৈঠা। হাতে তোলাই কঠিন। তার উপর নদীর স্রোত! আবার কান্না পাচ্ছে গগনের। খুব রাগ হচ্ছে বড়ো মামার উপর। কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, ছোটো মানুষটাকে হাতের মুঠো থেকে ছেড়ে দিয়ে...।

গগন অ্যাই গগন?

গগন অবাক, আরে নৌকা এপারে ভিড়েছে। আর মানুষটি নৌকা থেকে না নেমে ওকে ডাকছে। পরিচিত গলা তো নয়। ছোটো মামার এত সাহস নেই, সন্ধ্যার পর ঘর থেকেই বের হয় না। আর সে আসবে নদী পার করে নিতে? ভয়ে থরথর করে!

গগন তাকায়। মানুষটা হাত ইশারায় ওকে ডাকছে, নিচে নেমে এসো। তুমি ওপারে যাবে না?

হ্যাঁ, যাবো তো।

তাহলে দাঁড়িয়ে আছো কেন? তাড়াতাড়ি এসো। মানুষটার কণ্ঠের অভয় গগনকে আশ্বস্ত করে এবং গগন দ্রুত নিচে নেমে আসে। মানুষটা নৌকার গলুই থেকে আগায় এসে ওর হাত ধরে নৌকায় তোলে।

বসো নৌকার মাঝখানে।

ঠিক আছে। গগন বসে পাটাতানের উপর গুটিসুটি মেরে।

মানুষটি আবার নৌকার গলুইয়ে গিয়ে জোর হাতে বৈঠা বেয়ে নৌকাটা সোজা করে নদী পারি দিতে থাকে। বৈঠার আর পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনে গগন। তাকিয়ে আছে ওই পারে। কতক্ষণে পৌঁছে যাবে? পৌঁছে গেলেই একটা লাফ, একটা দৌড়...। এক দৌড়ে নানা বাড়ি। বাড়ি গিয়ে নানিবুয়াকে দিয়ে

ভীষণ বকা খাওয়াবে বড়ো মামাকে। ভাগ্যিস মানুষটা এসেছিল, নইলে...

গগন?

ফিরে তাকায় গগন, জি বলুন।

তুই কোন ক্লাসে পড়িস?

এই তো ক্লাস ফোরে।

তোর নানা রজব মৃধা তো মারা গেছেন ?

জি, আপনি জানেন?

মানুষটি উদাত্তভাবে বৈঠা চালাতে চালাতে জবাব দেন, চিনি। তোর নানা আমার বন্ধু ছিলেন।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। আর শোন মন দিয়ে লেখাপড়া করবি। ঠিক আছে?

ঘাড় কাত করে গগন, জি করব।

নৌকাটা তীরে এসে লাগে। গগন একটা লাফ দিয়ে নৌকা থেকে নামে। নেমেই নিচু থেকে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। উপরে উঠেই গগনের মনে হলো, এই মানুষটা যে আমাকে নৌকা পার করে দিয়েছে, তাকে আমি চিনি। কোথায় দেখেছি! ভাবতেই মনে পড়ে যায়, বইয়ের পাতায়। গগন ফিরে তাকায়। দেখে নৌকাটা নিয়ে মানুষটা ফিরে যাচ্ছে।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ওই পারে। মেলার লোকজন আসবে তো!

আপনি কে?

মানুষটা নদীর স্রোত কাঁপিয়ে হা হা হা শব্দে হাসেন, আমি? আমি শালিক, আমি নদী, আমি তেপান্তরের মাঠ, আমি বাংলার গান...

আপনি বঙ্গবন্ধু? গগন চিৎকার করে জানতে চায়।

নৌকা ততক্ষণে নদীর ওই পারে চলে গেছে। আর গগনের বঙ্গবন্ধু শব্দটি প্রতিধ্বনি হয়ে সমগ্র চরাচরে ভেসে বেড়াতে থাকে। ❑

শিশুসাহিত্যিক

মুজিব নামের ছবি

মো. পারভেজ হোসাইন

সবুজ-শ্যামল রূপে ভরা এ আমাদের দেশ
মুক্ত ধ্বনি জয় বাংলার শ্যামল পরিবেশ।
বাংলাদেশের মানচিত্র মুজিব নামে আঁকা
প্রিয় বাংলার স্বদেশভূমি রক্তে-রঙে মাখা।

জয় বাংলা জয়ধ্বনি মুজিব নামের ছবি--
মনের মাঝে সাহস যোগায় নিত্য জীবন লভি।
বীর-বাঙালির প্রিয় মানুষ জাতির পিতা তুমি
বিশ্ব সেরা শির ওঁচানো তোমার জন্মভূমি।

মহান তুমি জাতির পিতা তুমি আমাদের সব
তুমি জাতীয় নিত্যদিনের প্রাণের কলবর।

চির অমর বঙ্গবন্ধু

সাকিব আলম

অমর হয়ে আছেন তিনি
সকল বাঙালির মনে-প্রাণে
লাল-সবুজের পতাকা
পেয়েছি তাঁর আহ্বানে।

তাঁর ডাকে সারা দিয়ে
দিয়েছে বীর বাঙালি আত্মত্যাগ
সোনার বাংলা ছিনিয়ে আনতে
সব বিভেদ ভুলে হয়েছে এক।

৮ম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা

বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব তিনি অমলিন

মুহা. শিপলু জামান

সেদিন প্রস্তুত ছিল মঞ্চ, সম্পন্ন ছিল সকল আয়োজন। তিনি আসবেন, শুধুই তাঁর অপেক্ষা। তাঁর আগমনী বার্তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিল সাজ সাজ রব। তিনি আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দিনটি ছিল ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫, স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল। দিনটি হওয়ার কথা ছিল গৌরবোজ্জ্বল ও আনন্দের।

কিন্তু দিনটি তেমন হলো না, বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে এদেশের সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের মাধ্যমে দিনটি হয়েছে ক্ষতবিক্ষত, কলঙ্কময়, ভীতিকর আরেকটি দিন। ১৫ই আগস্ট ভোরের আলো ফোটার আগেই কাপুরুষ ঘাতক চক্রের নির্মম বুলেটের আঘাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে শাহাদত বরণ করেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ , বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ আবু নাসের, কৃষকনেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাতসহ অনেক নিকটাত্মীয়। সেদিন বাংলার আকাশ-বাতাস-পাখি সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, প্রকৃতি হয়েছিল বিষাক্ত আর দূষিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আসবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। তাই প্রাণের সাড়া লেগেছিল পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে। প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর আসার কথা ছিল সমাজবিজ্ঞান বিভাগে। আর সেখানে রূপার থালায় ফুলের পাপড়ি নিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে অভ্যর্থনা জানাতো বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলসহ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। ছোট্ট রাসেল বাবাকে অর্থাৎ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাবে, বিষয়টি চিন্তা করলেই প্রত্যেক বাবা-ছেলের গর্ব হবে, আনন্দে মন ভরে উঠবে। কিন্তু হায়েনার দল সেই অপরূপ চিত্রের রূপায়ণ হতে দিলো না। ঘাতকরা নিষ্পাপ ও কোমলমতি রাসেলকে রেহাই দেয় নাই; তারা এতটাই ভীত কাপুরুষ ছিল যে ভবিষ্যতের রাসেলকেও হুমকি মনে করেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম হলেও স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সমাবর্তনে আচার্য হিসেবে যোগদান করার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে তাঁর একান্ত সচিব ড. ফরাস উদ্দিনকে খুনসুটি করে বলেছিলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যাত্রা কখনোই সুখকর হয়নি' ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিনের (একান্ত সচিব) ভাষ্য, 'যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধু বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই তাঁকে 'সম্মানসূচক ডক্টর অব ল' ডিগ্রি দিতে যাচ্ছে, সেটি কতটা সুখের হবে; সম্ভবত সেই সংশয় থেকেই বঙ্গবন্ধু এমন মন্তব্য করেছিলেন।' (দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস, ১৫ই আগস্ট ২০২১)

বঙ্গবন্ধু যখন ১৯৪৯ সালে আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে। তারা ধর্মঘট করলে বঙ্গবন্ধু তাতে সমর্থন দেন ছাত্র হিসেবে। কিন্তু সমর্থন দেওয়াতে বঙ্গবন্ধুসহ অনেককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। সকলেই জরিমানা দিয়ে ছাত্রত্ব গ্রহণ করে কিন্তু বঙ্গবন্ধু ন্যায্য আন্দোলন তাই জরিমানা দিয়ে ছাত্রত্ব গ্রহণ করেননি। (সারাবাংলা, ১৫ই আগস্ট ২০১৮)

এছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সমাবর্তনে আচার্য হিসেবে প্রথম ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। এজন্য ঢাবির তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরীর মানপত্র পাঠ করার কথা ছিল। কিন্তু সেই মানপত্র আর পাঠ করা হয়নি (দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস, ১৫ই আগস্ট ২০২১)। রাজনীতির মহাকবি তাঁর দূরদর্শী চিন্তায় যে শঙ্কার কথা উল্লেখ করেছিলেন অবশেষে তেমনই হলো।

বাংলার জনগণকে ভালোবেসে বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা ও মহান স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আজীবন লড়াই-সংগ্রাম করেছেন, জেল-জুলুমসহ অমানবিক নির্যাতন সহ্য করেছেন কিন্তু বাঙালি ও বাংলার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত। মাত্র পঞ্চান্ন বছরের জীবনের এক-চতুর্থাংশ সময় প্রায় ১৩ বছর তিনি কারাভোগ করেন শুধুমাত্র বাঙালির অধিকার আদায়ে। ১৯৪৮ সালে ভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২ এর গণবিরোধী শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও '৭০ -এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বারবার

কারাবরণ করতে হয়েছে, পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু অসীম সাহসিকতার সাথে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার উদ্দেশে অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ঐ ভাষণে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেথে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। মূলত এ ভাষণেই নিহিত ছিল স্বাধীনতার ডাক। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে আটক হয়ে পাকিস্তানে কারারুদ্ধ ছিলেন তিনি একা, পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল, কারাগারের পাশেই তাঁর জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। দেশ, জনগণ ও পরিবার থেকে দূরে থেকেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত ছিলেন না। সেসময়ও তিনি ছিলেন অসীম সাহসী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী। বিজয় অর্জনের পর পাকিস্তানি বাহিনী তাঁর ব্যক্তিত্ব আর নেতৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করে তাঁকে সসম্মানে দেশে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হয়। দেশে ফিরে তিনি বাংলার জনগণকে বুকে জড়িয়ে, বাংলার মাটি ছুঁয়ে কেঁদেছেন অঝোর ধারায়। বাংলার জনগণের সাহস আর কৃতিত্বে তিনি ছিলেন মোহিত, ভালোবাসায় ছিলেন আবেগাপ্লুত। সারাজীবন মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপোশহীন। ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।'

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে আটক করে তাঁদের আস্তানায় নিয়ে যেয়েও তাঁকে স্পর্শ করার সাহস

পায়নি। অথচ তিনি বাঙালিদের বিশ্বাস করেছেন চোখ বন্ধ করে। সেই বাঙালি নামধারী কিছু বিশ্বাসঘাতক, কুলাঙ্গার যারা প্রতিনিয়ত বঙ্গবন্ধুর আশপাশে থাকতেন, বঙ্গমাতার রান্না করা খাবার খেতেন তারাই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। কীভাবে পারল তারা? সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করলে এর উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। কোনো সভ্য সমাজে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এরকম নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্ষমতা দখলের তীব্র বাসনায় রাষ্ট্রনায়ককে হত্যা করার খবর আমরা অনেক দেখেছি। কিন্তু এভাবে পুরো পরিবারকে একসাথে যেখানে নারী-শিশু এমনকি অনাগত ভ্রুণসহ হত্যা করা হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো অধ্যায় বাকি ছিল না এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায়। বিশ্বে আজ কোনো ঘটনা ঘটলেই তথাকথিত মানবাধিকারের মোড়লরা সমস্বরে প্রতিবাদী হয়ে উঠে কিন্তু সেদিন তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেদিন মানবতা আর মানবাধিকার অস্ত্রের ঝঙ্কার আর হুঙ্কারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাংলা আর বাঙালিদের ললাটে কালিমা লেপে দিয়েছিল, করেছিল কলঙ্কময়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে খুনির দল সদম্ভে হত্যার কথা স্বীকার করেছিল। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি মেজর ফারুক ১৯৭৬ সালের ৩০শে মে লন্ডনের 'দি সান্ডে টাইমস' পত্রিকার এক নিবন্ধে বলেছিল 'আমি শেখ মুজিবকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছি। ইচ্ছা করলে বাংলাদেশ সরকার আমার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে'। তারা এতটাই হিংস্র আর রক্তপিপাসু ছিল যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ বিচারের হাত থেকে খুনিদের রক্ষা করতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে এবং পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে সেটি আইন হিসেবে অনুমোদন করা হয় (ইত্তেফাক, ২রা আগস্ট ২০২৩)।

হায়েনার দল ভেবেছিল বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করে বাংলার মাটি থেকে নিঃশেষ করে দিতে পারবে। কিন্তু তারা অনুধাবন করতে পারেনি বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। বাংলার প্রতিটি মানুষের অন্তরে বাস করেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু আজ অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশি অনুপ্রেরণার। ঘাতকচক্র মনে করেছিল ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার হবে না, কিন্তু সত্য ও ন্যায় দেরিতে হলেও বিজয়ী হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়েই সেই কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইন বাতিল হয় এবং বিচার কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ এক যুগ বিচার কার্যক্রম চলার পর ২০১০ সালের ২৮শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার পাঁচ আসামীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে কিছুটা হলেও জাতির দায়মুক্তি হয়। তবে দণ্ডিত পাঁচ খুনি এখনো বিভিন্ন দেশে পালিয়ে আছে। রাশেদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে এবং নূর চৌধুরী কানাডায়, তাদের ফিরিয়ে আনতে সরকারের তরফ থেকে যোগাযোগ করা হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সরকারের সাড়া মেলেনি। আর রশিদ, ডালিম ও মোসলেম উদ্দিন কোথায় আছেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য এখনো জানতে পারেনি সরকার (বিডি নিউজ ২৪, ১৮ই আগস্ট ২০২১)।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুকে শেখ রাসেলসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীরা ফুলেল শ্রদ্ধা জানাতে পারে নাই কিন্তু আমরা এখন প্রতিনিয়ত বঙ্গবন্ধুকে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানাই। প্রত্যেক বাঙালির মন মহান এই নেতার জন্য সর্বদা কাঁদে, বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সবাই তাঁকে খুঁজে বেড়ায়।

বঙ্গবন্ধু আজীবন সাম্য, মৈত্রী, গণতন্ত্রসহ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক, মুক্তির দূত। ১৯৭৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত-শোষক আর শোষিত: আমি শোষিতের পক্ষে'।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতার এক বছরের মাথায় তিনি প্রণয়ন করেন একটি গণমুখী সংবিধান। বঙ্গবন্ধু শুধু একটি দেশই উপহার দেননি; তিনি সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক,

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো কেমন হবে তারও একটি যুগোপযোগী রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর নীতি ও আদর্শ বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের অধিকার আদায়ে এবং শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণজাগরণে সবসময় অনুপ্রেরণা যোগাবে। বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব, তিনি অমলিন। বঙ্গবন্ধু এ দেশের লাখো-কোটি বাঙালিরই শুধু নয়, বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করাই আমাদের একান্ত দায়িত্ব। জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে নিজেদের আত্মনিয়োগ করবো–এই হোক জাতীয় শোক দিবসের অঙ্গীকার। ❑

তথ্যসূত্রঃ

১. সারাবাংলা, ১৫ই আগস্ট ২০১৮, https://sarabangla.net/post/sb-125170/

২. দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস, ১৫ই আগস্ট ২০২১, https://thedailycampus.com/universities/

৩. শোকাবহ আগস্ট, দৈনিক ইত্তেফাক, ২রা আগস্ট ২০২৩

৪. wewWwbDR24, ১৮ই আগস্ট ২০২১, https://bangla.bdnews24.com/mujib100/article1926230.bdnews

---

উপপ্রেস সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা

একটি খোকা

নূর মোহাম্মদ দীন

একটি খোকা জন্ম নিলো সোনার বাংলাদেশে
সেই খুশিতে ফুল-পাখিরা উঠল কত হেসে!
হাসল নদী আকাশ বাতাস হাসল সাগর পাহাড়
খুশির খবর রটে গেল পাড়া গাঁয়ে তাঁহার।
ছোট্ট খোকা ধীরে ধীরে বড়ো হলো যখন
ঘর পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে এল তখন।
তুচ্ছ করা উপচে পড়া চঞ্চল তাঁর মন
কী যেন কী ভাবল খোকা ভাবল সারাক্ষণ।
ভাবতে গিয়ে চাইল খোকা- চাইল বাংলাদেশ
শস্য-শ্যামল দেশটি হবে শান্ত সুখী বেশ।
লাল-সবুজের নিশান হবে, খেলার মাঠ ঘর হবে
ভাবত খোকা আপন মনে আসবে সেই দিন কবে ?
এমনি একদিন সুদিন এল খোকার ডাকে ভোর হলো,
বলতে পারো কে এই খোকা ? বলো শুনি বলো
সেই খোকাটি শেখ মুজিবুর হলেন জাতির পিতা
বাঙালি আর বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সবার মিতা।

পিতার নাম

খসরু পারভেজ

কালের খাতায় লেখা থাকে কজনার নাম ?
একটি নামের মূল্য অনেক লক্ষ কোটি দাম !
সেই নামেতে যদি ফোটে স্বাধীনতার ফুল ;
নামটি যখন উপড়ে ফেলে বিষবৃক্ষের মূল !

সেই নামেতে কেঁপে ওঠে শত্রু সেনার বুক ;
স্বদেশ প্রেমের পরশ মাখা সূর্য ছোঁয়া মুখ !
কার নামেতে রৌদ্র ফোটে আঁধার হয় যে দূর ?
টুঙ্গিপাড়ার সোনার ছেলে সে শেখ মুজিবুর।

কোন্ নামেতে ছিড়ল শেকল দুঃখ হলো শেষ ?
বিশ্ব বুকে উঠল হেসে সোনার বাংলাদেশ ?
ভুবন ভরা একটি নামের আকাশ ছোঁয়া গান ;
জাতির পিতা সে যে শেখ মুজিবুর রহমান ।

স্বাধীন দেশে রক্তনেশায় ঘাতক হাসে ওই !
মুছে ফেলে নামটি যে তাঁর, মুজিব গেল কই ?
যে নাম লেখা ভালোবাসায় মনের ফলকে ;
সে নাম কি কেউ মুছতে পারে চোখের পলকে !

মুজিব মানেই বাংলাদেশ আর স্বর্ণালি রোশনাই ;
সে নামেতে হাজার কবি কাব্য লেখে তাই।
মুজিব থাকে বুকের ভেতর মহাকালের ধাম ;
মুজিব মানেই মুক্তির চিঠি জ্বলজ্বলে এক খাম।

মুজিব আছে

নূর আলম গন্ধী

কে বলেছে মুজিব নাই
মুজিব আছে বঙ্গে
প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে
সকল ভালোর সঙ্গে।

কে বলেছে মুজিব নাই
মুজিব আছে টিকে
ছন্দ সুরে কাছে দূরে
রোজই চারিদিকে।

কে বলেছে মুজিব নাই
মুজিব আছে প্রাণে
হাজার নদীর স্রোতধারায়
মাটির সুধা ঘ্রাণে।

কে বলেছে মুজিব নাই
মুজিব আছে বাগে
ন্যায় ও নীতির সুবাস ছড়ায়
জাগি অনুরাগে।

কে বলেছে মুজিব নাই
মুজিব আছে গানে
লাল-সবুজের পতাকা ও
পাখির কলতানে।

কে বলেছে মুজিব নাই
মুজিব আছে থাকবে
তিনি হলেন জাতির পিতা
খুব যতনে আঁকবে।

সেই খোকাই বঙ্গবন্ধু

বিজন বেপারী

ছোট্ট খোকা জন্ম নিলেন
টুঙ্গিপাড়ার কোলে,
তাঁর খুশিতে পথের ধারে
ফুল পাখিরা দোলে।

সেই যে খোকা মহান হবেন
ছাপ রাখেন তাঁর কাজে,
দুঃখীজনে দান করিতেন
খুশি হতেন মা যে।

খোকা ছিলেন দয়ার সাগর
কাঁদেন সবার দুখে,
মানতে নাহি পারেন তিনি
রবেন একা সুখে।

ছোট্ট খোকার মনে-প্রাণে
পরাধীন এই দেশটা,
তাই তো তিনি শত্রু পানে
পাতেন নিজের বুকটা।

সেই খোকাই বঙ্গবন্ধু
গড়েন বাংলাদেশটা,
জগৎ মাঝে ভেসে বেড়ায়
ছোট্ট খোকার মুখটা।

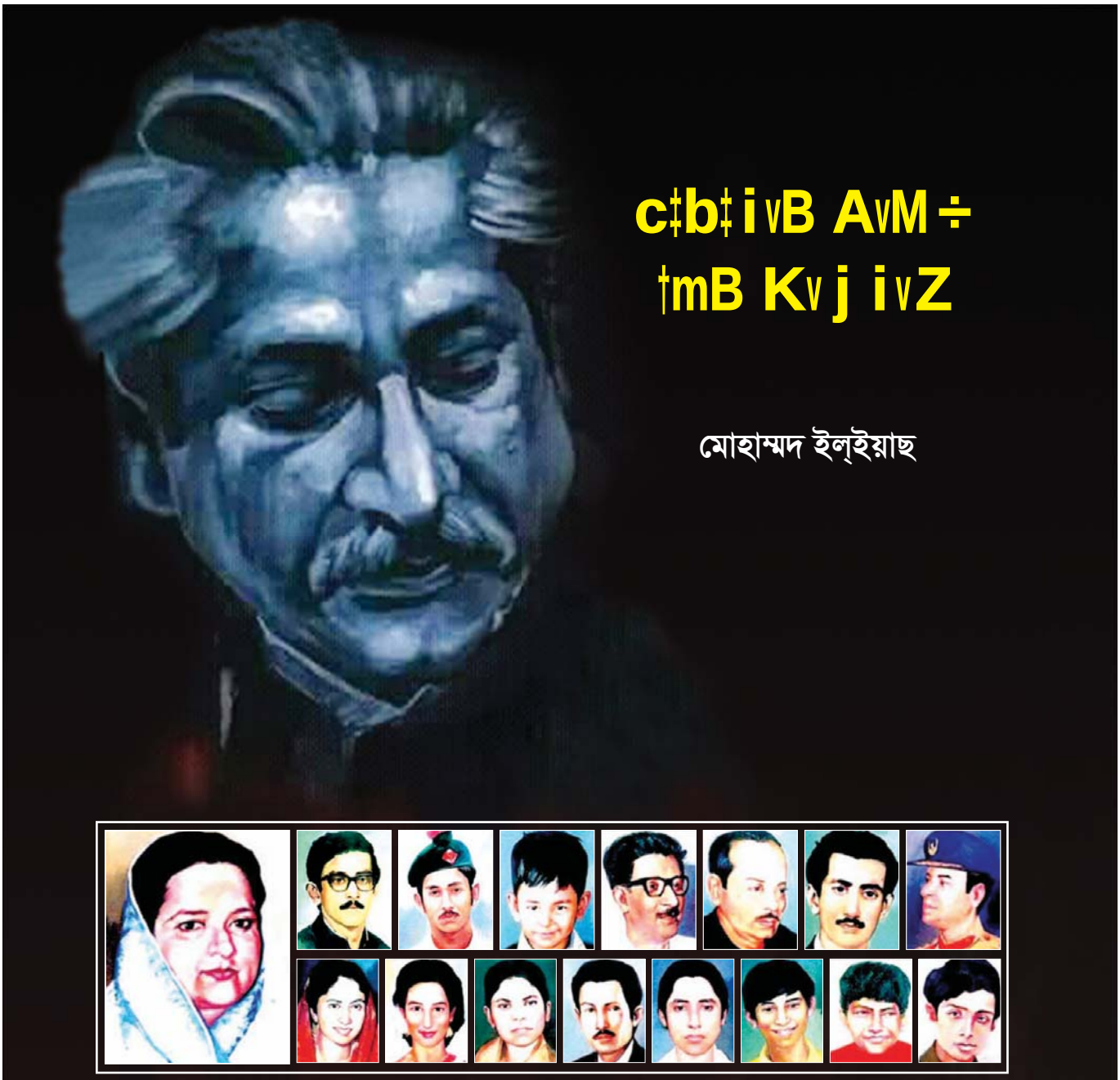

c‡b‡ivB AvM÷ †mB Kvj ivZ

মোহাম্মদ ইল্ইয়াছ

বাংলাদেশ ও বাঙালির কালপঞ্জিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালিমালিপ্ত দিন। এদিন বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একই সাথে তাঁর দুটি কন্যা সন্তান ছাড়া পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয় । অন্য দুটি বাড়িতে তাঁর ভাগ্নে ও ভগ্নিপতিদের অধিকাংশ সদস্যদের হত্যা করা হয়। আগস্ট শোকের মাস, স্বজন হারানোর আর্তি জানানোর মাস। আমরা এদিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করি।

সেই পঁচাত্তরের শোক ও বেদনা আমরা আজও বয়ে বেড়াচ্ছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের মাঝে সেই পঁচাত্তরের ঘটনা ও হারিয়ে যাওয়া কচি মুখগুলো আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয় জীবন্ত হয়ে। আমাদের দুঃখ ও বেদনাগুলো শোকে পাথর হয়ে যায়। কী দোষ করেছিল পঁচাত্তরে নিহত কচি-কিশোর প্রাণগুলো? এ প্রশ্ন চিরকাল বাঙালির হৃদয়ে হানা দেবে। চোখে জল ঝরাবে।

১৫ই আগস্টের ভোরে হত্যাকারীরা একযোগে ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়ি ও শেখ মনির বাড়ি এবং মিন্টু রোডের মন্ত্রীপাড়ায় মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় হানা দিয়ে যাকে সামনে পায় তাকে হত্যা করে। সেদিনের হত্যাকাণ্ডে শহিদেরা হলেন :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল খুকী, দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল, শেখ জামালের স্ত্রী পারভীন জামাল রোজী, বঙ্গবন্ধুর দশ বছরের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, বঙ্গবন্ধুর ছোটো ভাই শেখ আবু নাসের, বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী সভার সদস্য আবদুর রব সেরনিয়াবাত, সেরনিয়াবাতের তেরো বছরের কন্যা বেবী, চার বছরের পুত্র আরিফ ও চার বছরের নাতি সুকান্ত বাবু, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুব নেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর স্ত্রী বেগম আরজু মনি, কর্নেল জামিল উদদীন আহমেদ, শহীদ সেরনিয়াবাত, আবদুল নঈম খান রিন্টু, পুলিশ কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান এবং তিনজন অতিথি ও চারজন গৃহকর্মী। এদের মধ্যে শেখ রাসেল, বেবী, আরিফ, সুকান্ত বাবু ও রিন্টু ছিল শিশু-কিশোর।

এ হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি আরেকটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে ক্যাপটেন মহিউদ্দিনের ছোঁড়া কামানের গোলা গিয়ে পড়ে মোহাম্মদপুরের শেরশাহ সুরী রোডের ৮ও ৯ নং বাড়ি এবং শাহজাহান রোডের ১৯৬/১৯৭ বাড়িতে। সেখানে কামানের গোলার আঘাতে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডে চারটি ঘরে মারা যায় ১৩ জন। এদের মধ্যে নাসিমা ছিল শিশু সন্তান। অন্যরা ছিল: রেজিয়া বেগম, কাসেদা, সাবেরা বেগম, সাফিয়া খাতুন, আনোয়ারা বেগম, ময়ফুল বিবি, আনোয়ারা বেগম-২, হাবিবুর রহমান, আবদুল্লাহ, রফিকুল, শাহাবুদ্দিন, হনুফা বিবি ও আমিনউদ্দিন।

পনেরোই আগস্ট শাহাদত বরণকারী শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র। তখন তার বয়স ছিল ১০/১১ বছর। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরির স্কুল ও কলেজের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল শেখ রাসেল। ঘটনার সময় শিশু রাসেল বাঁচার আকুতি জানিয়ে ছিল খুনি হুদা ও নুরের কাছে। তাঁকে বাঁচতে দেয়া হয়নি। বাবা, ভাই মা ও ভাবিদের লাশ দেখিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

কিশোরী বেবী ও আরিফ আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ছেলে-মেয়ে। পড়াশুনা করতো এবং বাবার মিন্টু রোডের বাসায় থাকতো। সে রাতে বেবী আহত হলে হাসপাতালে নেওয়া হয়, তখনো সে বেঁচে ছিল। তাঁকে খুনিদের ভয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বেবী। তাদের সাথে থাকতো বড়ো ভাই-হাসানাত আব্দুল্লাহর ছেলে শহিদ সেরনিয়াবাত। ঐ বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল প্রখ্যাত রাজনীতিক আমির হোসেন আমুর খালাতো ভাই রিন্টু। রিন্টুও তাদের সাথে নিহত হন সেই আজান দেয়া ভোরে।

ধানমন্ডির শেখ ফজলুল হক মনির বাসায় তাপস ও পরশ খাটের নিচে লুকিয়ে থাকায় খুনিরা খুঁজে পায়নি, তাই তাদের খুন করতে পারেনি সেদিন। আল্লাহর অপার মহিমায় তারা বেঁচে যান। মোটকথা এরাই ছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের শহিদ শিশু-কিশোর। কচি, কোমল ও নির্মম এসব শিশু-কিশোররা পৃথিবীতে এসেছিল বেদনা বইতে। ফুল ফোটার আগে ঝরা ফুলের মতো তারা হারিয়ে গেল আমাদের কাঁদিয়ে। খুনির ফাঁসি হয়েছে। এতে কি আমাদের পাপ মোচন হয়েছে ? হয়নি। আজও তাদের স্মৃতি আমাদের শোক সাগরে ভাসায়। আগস্ট এলে সেই কচি-কোমল মুখগুলো আমাদের সজল চোখে ভেসে ওঠে। আগস্টের সকল শহিদদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই বিনম্র চিত্তে। ❑

তথ্যপঞ্জি

১. শেখ মুজিব আমার পিতা: শেখ হাসিনা. আগামী প্রকাশনী

২. মুজিব বাংলার বাংলা মুজিবের: শেখ হাসিনা. জিনিয়াস. ঢাকা

৩. আগস্টের কালরাত্রি: চন্দ্রদ্বীপ. মোহাম্মদপুর. ঢাকা।

শিশুসাহিত্যিক

ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের এই বাড়িতেই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার

তোমার বাণী ও আমাদের ঋণ

ডা. হারুন-অর-রশিদ

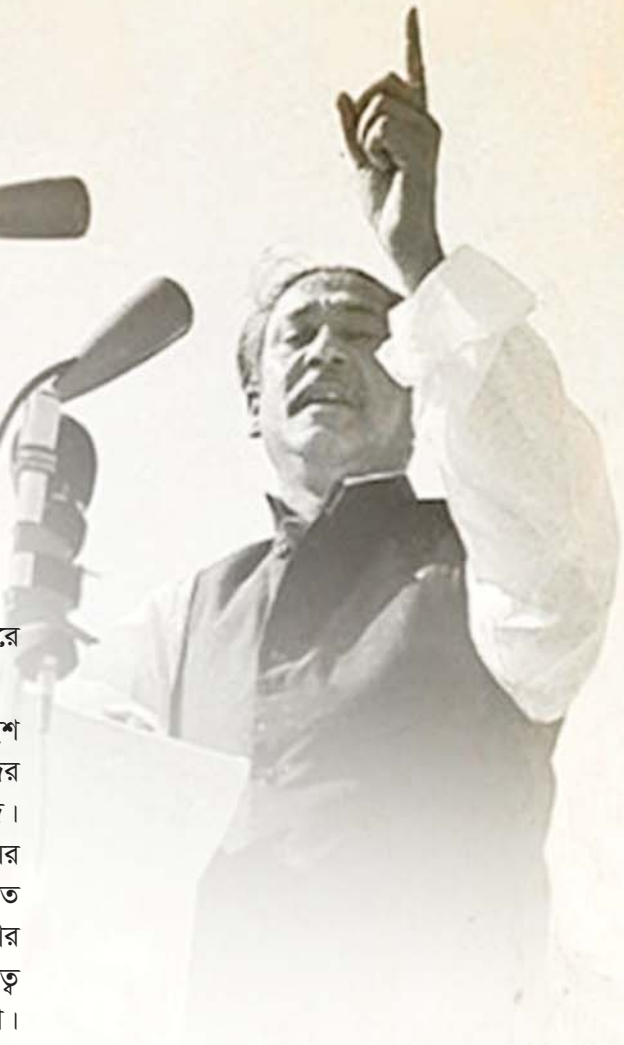

তুমি বলেছিলে, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।'

–আমরা এই বাণীকেই স্বাধীনতার ঘোষণা ধরে নিয়েছি।

তুমি যা বলেছিলে তাই হয়েছিল, সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে মানুষের মনে জাগিয়েছিলে নিজেদের অধিকারবোধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রতিবাদ। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার রক্তচক্ষু ও তাদের দোসর অপরাজনীতিকদের বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র তোমায় টলাতে পারেনি মুহূর্তের জন্যও। তুমি সমস্ত জাতিসত্তার ভার যে নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলে। তোমার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ত্যাগে আমরা পেয়েছি এক স্বাধীন দেশ,বাংলাদেশ।

তুমি বলেছিলে, 'পৃথিবীর মানুষ আজ দু'ভাবে বিভক্ত। শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতদের পক্ষে'।

তুমি আরো বলেছিলে, 'আপনারা (ধনীক শ্রেণি ও স্যুটেড-কোটেড শ্রেণি) কৃষকদের সম্মান করে কথা বলুন'।

হাজার বছরের পরাধীন বাঙালি জাতি তোমার ত্যাগে একটা ভূখণ্ড নিজ নামে পেয়েছে। তাই তুমি হয়েছো বঙ্গবন্ধু। সাধারণ মানুষদের বেশি ভালোবাসতে বলেই তাদের (কৃষক-শ্রমিক) নিয়ে রাজনীতিটা সাজাতে চেয়েছিলে। কিন্তু বেনিয়া শাসকগোষ্ঠীর বখে যাওয়া কিছু কুলাঙ্গারের তা সহ্য হয়নি। মেতে উঠেছিল সমাজের উচ্ছিষ্ট নরকের কীটগুলো রক্তের হোলিখেলায়। তাদের নোংরা হাতে পবিত্র রক্ত ঝরিয়েছিল পবিত্র মাটিতে।

তোমার দেহকে তারা পরাভূত করেছে সত্যি, তোমার আত্মাকে নয়। আমাদের সবার আত্মা মিশে আছে তোমার অবিনশ্বর আত্মার সাথে। জাতি সীমাহীন ঋণে ঋণী হয়ে গেছে তোমার কাছে। তোমার আত্মার দীপ্যমান বাতিঘর এখনো জাতির দিশা হয়ে আছে।

আজ আগস্টের এই দিনে প্রার্থনা করি, তোমার আত্মার বাতিঘরের আলো ছড়িয়ে পড়ুক সবার প্রাণে প্রাণে আর দেশের কোণে কোণে। ❑

অধ্যাপক, নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ

wcq gwRe

সুজন সাজু

মুজিব একটি নাম শুধু নয় সীমানাহীন আকাশ,
সবকিছু তার স্বচ্ছতাময় জীবন যদি তাকাস,
শিশু থেকে মনটা ছিল মানবতার প্রেমে,
আদর্শ তার বাংলা জাতি রাখলো হৃদের ফ্রেমে।
তার নামেতে সাহস জাগে বাড়ে অপার ধৈর্য,
জীবন নায়ে ফুল সৌরভে শেখ মুজিব ঐশ্বর্য।
ফুল ফুটানো বাগানে যেমন রূপে টানে মন,
মুজিবাদর্শ করলে ধারণ নির্লোভ মানে মন।
সৎ নীতিতে অটল ছিল পড়েনি কালোর দাগ,
জাতির কল্যাণে ব্রতী মুজিব সত্যি আলোর বাঘ।
মুজিব একটি নাম শুধু নয় সাগরের ন্যায় উদার,
বীর বাঙালির অন্তরে তাই নামটি মুজিব সুধার।
ঢেউ তরঙ্গে আছে মিশে স্বচ্ছ পানির সাথে,
ধ্যানের জ্ঞানে পবিত্রতায় ডাকলে মুজিব মাতে।
অবিশ্বাসীর বেলায় তবে ভাব হবে কল্পনা,
মুজিব মানে অকূল সাগর এটা কোনো গল্প না।
চাঁদ তারাদের ঝিকিমিকি আকাশ যেমন জ্বলে,
বাংলার ঘরে মাঠ প্রান্তরে মুজিবের নাম বলে।
মুজিব আছে অন্তরে ঠিক মুজিব আছে শ্বাসে,
হর হামেশা দেখছি তারে প্রিয় মুজিব হাসে।

মুজিব হাসে

শাকিব হুসাইন

মুজিব হাসে রোজ সকালে
পাখির কলতানে
মুজিব হাসে মিষ্টি অলির
মুগ্ধ করা গানে।

মুজিব হাসে পতাকাতে
হাসে যে আর দোলে
মুজিব হাসে আমার দেশে
বাংলা মায়ের কোলে।

মুজিব হাসে আমার দেশে
সকল গাঁয়ে গাঁয়ে
মুজিব হাসে পদ্মা নদীর
পাল তোলা ওই নায়ে।

মুজিব হাসে সোনার দেশে
চাষির ঘরে ঘরে
তোমার হাসি বারে বারে
তাই তো মনে পড়ে।

স্মৃতির পাতায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার

বিশ্বস্ত সহচর ও নীরব সহযোদ্ধা

রহিমা আক্তার মৌ

‘যখন তখনই শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে যেতে হয়েছে। কারাগারে নেওয়া হয়েছে শুনলেই যেতাম শেখ মুজিবের বাড়ি। গিয়ে দেখতাম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব কাপড় চোপড়, বালিশ বিছানা গুছিয়ে পাঠাচ্ছে কারাগারে। এমন দৃশ্য অনেক বার দেখেছি আমি নিজেই।’ — সুফিয়া কামাল।

মাত্র ৫৫ বছর বয়সে প্রায় ১৩ বছর কারাগারে থাকতে হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এর মধ্যে ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৮ সালে স্কুলের ছাত্র অবস্থায় ৭ দিন, বাকি ৪ হাজার ৬৭৫ দিন তাঁর জেলে কাটে পাকিস্তান আমলে। রাজনীতিতে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের খ্যাতি যখন তুঙ্গে, তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুকে একজন ছাত্রনেতা হিসেবে কবি সুফিয়া কামাল চিনতেন। পরে বঙ্গবন্ধু নেতা হিসেবে সারাবিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কবি তাঁকে নিজের ছোটো ভাইয়ের মতোই দেখতেন। আর বঙ্গবন্ধুও তাকে 'আপা' বলে সম্বোধন করতেন এবং সম্মান করতেন। তিনি জীবনে অনেকবারই বঙ্গবন্ধুর কাছাকাছি গেছেন এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও একই পাড়াতে থাকতেন বলে মুজিবের সাথে সম্পর্কটা ছিল পারিবারিক। মুজিব জেলে গেছে শুনলেই পরিবারের কাছের মানুষের মতো বাড়িতে ছুটে গিয়ে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের সাথে দেখা করতেন খোঁজখবর নিতেন।

'সে (রেণু) তো নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু কিছু বলে না। কিছু বলে না বা বলতে চায় না, সেই জন্য আমার আরও বেশি ব্যথা লাগে।' -- বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী।

জাতির পিতার 'রেণু' হলেন বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তিন বছর বয়সে জেঠাতো ভাই শেখ মুজিবুর-এর সাথে পারিবারিকভাবে বিয়ে ঠিক হয় রেনুর। পাঁচ বছর বয়সে বাবা শেখ জহুরুল হক ও মা হোসনে আরা বেগমকে হারিয়ে এতিম হয়ে যান তিনি। মাত্র আট বছর বয়সে পাকাপাকিভাবে বিয়ে হয় ছোটো রেণুর। সেই রেণুই একদিন হয়ে যান বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সহচর।

সেই ছোট্ট মেয়েটি কি ভেবেছিলেন একদিন তিনি বাংলাদেশের প্রথম ফার্স্ট লেডি এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্ত্রী হবেন? হয়েছেন, কিন্তু নির্মম দেশদ্রোহিতার কাছে তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে যায় অল্পদিনেই। সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন না বঙ্গমাতা। তবে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রেরণার সবচেয়ে বড়ো উৎস ছিলেন তিনিই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জাতির পিতার পাশে থেকে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন।

বেগম মুজিব কষ্ট পেয়ে স্বামীকে বলেন, 'জেলে থাকো আপত্তি নেই। তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখো। তোমাকে দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমার বোঝা উচিত আমার দুনিয়ায় কেউ নাই। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেছেন তোমার কিছু হলে বাঁচব কি করে?'

এ মহীয়সী নারীর জন্ম ও মৃত্যু হয় একই মাসে। ১৯৩০ সালের ৮ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দুই কন্যা ছাড়া পরিবারের সবার সাথে তাঁকেও হত্যা করা হয়। সেদিনেই তিনি আলাদা হয়ে যান তাঁর ছায়াসঙ্গী বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে। কারণ বঙ্গবন্ধু চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় আর বঙ্গবন্ধুর রেণুর কবরস্থান ঢাকার বনানীতে।

শিল্পী হাশেম খান বলেন, 'পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতায় এলে তাঁদের স্ত্রীরা হন ফার্স্ট লেডি। কিন্তু এটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের জন্য ফার্স্ট লেডির চেয়ে বড়ো ভূমিকা রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা' থেকে আমরা সেটা জানতে পারি। কী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কী মানসিক ও অর্থনৈতিক যাতনার মধ্য দিয়ে এই মহীয়সী নারী তাঁদের শুধু লালন-পালনই করেননি, বাংলাদেশের একেকজনকে সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলেছেন।'

বঙ্গমাতাকে নিয়ে অধ্যাপক মাহমুদা খাতুন লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে শুধু রাজনৈতিক দিকনির্দেশনাই নয়, ফজিলাতুন নেছা মুজিব নেতাকর্মীদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে, প্রয়োজনে পাশে দাঁড়িয়েছেন মমতাময়ী জননীর মতো। অসুস্থ মওলানা ভাসানীকে দেখতে ফলমূল, খাবার-দাবার নিয়ে ছুটে গেছেন হাসপাতালে। আবার খন্দকার মোশতাক জেলে থাকাকালীন তাঁর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে লন্ডন পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। বেগম মুজিব কখনো কোনো দায়িত্ব পালনে পিছপা হননি।' - (তথ্যসূত্র: ৮ই আগস্ট ২০২২, এনটিভি অনলাইন)

শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সম্পর্কে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন 'তিনি (শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব) আমাদের সময়ের খনা, এই সময়ের বেগম রোকেয়া, এই সময়ের চন্দ্রাবতী। তিনি ইতিহাসের মানুষ।'

আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখিনি, দেখিনি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকেও। কিন্তু আমি পড়তে পড়তে জানতে পারি উনাদেরকে। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এবং দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গবন্ধু যখন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, বিভিন্নভাবে মানুষের সেবা করেছেন। সেই সময় বঙ্গবন্ধুর সাথে একইরকম মনোভাব নিয়ে সার্বক্ষণিক সমর্থন দিয়ে গেছেন শেখ ফজিলাতুন নেছা। এমনকি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রচারণা ও সার্বিক কর্মকাণ্ডে অপরিসীম সহযোগিতায় বেগম মুজিবকে একান্তভাবে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। এমনও জানতে পারি যে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করতে রাস্তায় নেমে লিফলেট বিতরণ করেছেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব।

বঙ্গমাতার জীবনের কিছু অংশ ফুটে উঠে তাঁরই কন্যা শেখ রেহানার লেখনীতে।

'গ্রামে জন্ম হওয়া একজন সাধারণ নারী আমার মা, ক্লাস ফোর-ফাইভ পর্যন্ত পড়েছেন মিশনারি স্কুলে। কিন্তু কী যে প্রজ্ঞা, কী যে তাঁর ধৈর্য। আমার মায়ের কাছে আমাদের যে জিনিসটা সবার আগে শেখা উচিত, তা হলো ধৈর্য্য আর সাহস। এতগুলো লোক বাড়িতে খাচ্ছে, দাচ্ছে, আমাদের গ্রামে কোন মেয়ে ম্যাট্রিক পাস করেছে, তাকে এনে ঢাকায় কলেজে ভর্তি করে দাও, কাকে বিয়ে দিতে হবে! সব সামলাচ্ছেন। আমার তো মনে হয়, আমার মা কি কোনো দিন তাঁর শৈশবে কিংবা কৈশোরে একটা ফিতা বা রঙিন চুড়ি চেয়েছেন কারও কাছে! মা-ই তো সব থেকে বঞ্চিত ছিলেন। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখে আসছি, আমার বাবা কারাবন্দি। মা তার মামলার জন্য উকিলদের সঙ্গে কথা বলছেন, রাজবন্দি স্বামীর জন্য রান্না করে নিয়ে যাচ্ছেন, গ্রামের শ্বশুর-শাশুড়ি ও আত্মীয়স্বজনের খবরাখবর রাখছেন। কারাগারে দেখা করতে গিয়ে স্বামীর কাছে বাইরের সব খবর দিচ্ছেন এবং তার কথাও শুনে আসছেন। কাউকে জানানোর থাকলে ডেকে জানিয়েও দিচ্ছেন। এরমধ্যে ছেলেমেয়েদের আবদার, লেখাপড়া, অসুস্থতা, আনন্দ-বেদনা সবকিছুর প্রতিও লক্ষ রাখতে হয়। এতকিছুর পরও তাঁর নিজের জন্য সময় খুঁজে নিয়ে তিনি নামাজ পড়ছেন, গল্পের বই পড়ছেন, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করছেন। কী ভীষণ দায়ভার বহন করছেন! ধীর-স্থির এবং প্রচণ্ডরকম সহ্যশক্তি তাঁর মধ্যে ছিল। বিপদে, দুঃখ-বেদনায় কখনো ভেঙে পড়তে দেখিনি। বরং সেখান থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজতে চেষ্টা করেছেন- এটাই ছিল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।'

শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন,

'জাতির পিতার জন্য প্রেরণা, শক্তি ও সাহসের উৎস ছিলেন বঙ্গমাতা। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সাফল্যেও বঙ্গমাতা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। জাতির পিতা রাজনৈতিক কারণে প্রায়শই কারাগারে বন্দি থাকতেন। এই দুঃসহ সময়ে তিনি হিমালয়ের মতো অবিচল থেকে একদিকে স্বামীর কারা মুক্তিসহ আওয়ামী লীগ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ছয় দফা ও ১১ দফার আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দি থেকে এবং পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা সত্ত্বেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। দেশ ও জাতির জন্য তার অপরিসীম ত্যাগ, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতার কারণে জাতি তাকে যথার্থই 'বঙ্গমাতা' উপাধিতে ভূষিত করেছে। --(তথ্যসূত্র : ৮ই আগস্ট ২০২০, ডেইলি স্টার বাংলা)

বঙ্গমাতাকে আরেকভাবে আবিষ্কার করি শেখ রাসেলকে নিয়ে পড়তে গিয়ে। রাজনীতি আর কারাজীবনের জন্যে বঙ্গবন্ধুকে কাছে পেতো না ছোট্ট রাসেল। কিন্তু বাবাকে তো বাবা বলে ডাকতে ইচ্ছা হতো। অবুঝ রাসেল তো সব বুঝতো না, তাই মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে মাঝেমাঝেই বাবা বলে ডাকতেন। বঙ্গমাতার দুই কন্যার লেখাসহ আরো অনেকের লেখা পড়ে যে বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে তিনি কীভাবে ঘর বাহির সামলাতেন। সন্তানদের চাওয়া পাওয়াকে একাই ভরিয়ে দিতেন আদর, ভালোবাসা আর দায়িত্ববোধ দিয়ে। প্রতিমুহূর্তে নিজেকে তৈরি করেছেন একজন দেশপ্রেমিকের জীবনসঙ্গী হিসেবে। ইচ্ছে করলে আরাম-আয়েশের জীবন বেছে নিতে পারতেন, কিন্তু তা না করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পাশেই ছিলেন। ❑

সাহিত্যিক, কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক

কালো রাতের কথা

সালাম হাসেমী

হায়েনার দল দিলো হানা জাতির পিতার বাড়ি,
রক্তে রক্তে লাল করে ঘর গড়ল লাশের সারি।
রইল না কেউ হলো বিনাশ ওই দিন কালো রাতে,
কাঁপলো না প্রাণ, এমন কার্য করতে নিঠুর হাতে।
যে পিতার জন্য পেলে তোমরা স্বাধীনতা,
তারই জন্য জাগলো না যে, প্রাণে কৃতজ্ঞতা।
ধিক হায়েনা, তোমরা জতির কলঙ্ক যে বড়ো,
তোমাদের নাম মীর জাফরের পাশে মনে করো।
ওই কালো রাত বার বার ফিরে আসে জাতির বুকে,
কেঁদে কেঁদে একাকার হয় পিতৃহারা দুখে।
পিতা আছে পিতা থাকবে হয়ে জাতির গর্ব,
কোনো কালে এতটুকু হবে না যে খর্ব।

শোক

সোহরাব পাশা

জেগে ওঠে সাতকোটি প্রাণ
একাত্তরে জানি
সাতই মার্চে ছড়িয়ে দিলে
বজ্রকণ্ঠ বাণী

ডাক শুনে তাই গেরিলারা
অস্ত্র হাতে লড়ে
পাক-সেনাদের হার মানিয়ে
দেশটা স্বাধীন করে

পঁচাত্তরের আগস্ট মাসে
শোকে মুহ্যমান
ঘাতক খুনি কেড়ে নিল
জাতির পিতার প্রাণ ।

বুকের ভেতর কষ্ট তবু

নাসির আহমেদ

তোমার জন্য পেয়েছি এই স্বাধীন সোনার দেশ
জাতির পিতা তুমিই দেশের মুছলে সকল ক্লেশ।
তোমার কণ্ঠে লক্ষ কণ্ঠ বেজে ওঠে তাই
মহান মুজিব প্রাণে তোমার তাই তো সাড়া পাই।

তোমার কথাই কাব্যগাথায়, গানের সুরে সুরে
নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে আছো, যতই থাকো দূরে।
সেই যে তোমার দৃপ্ত ভাষণ- বজ্রকণ্ঠ স্বর
জাগিয়ে দেশ দেশকে আজো, রক্তে আনে ঝড়!

তুমি আছো কামার-কুমার, জেলে-তাঁতির প্রাণে
নায়েক মাঝি বৈঠা চালায় তোমারই জয়গানে।
পাখপাখালির সুরেও যেন তোমারই উচ্ছ্বাস!
সাতই মার্চের সে উচ্ছ্বাসই লিখছে ইতিহাস।

পনেরো আগস্ট এলেই তবু শ্রাবণ-কালো মেঘে
বুকের ভেতর বৃষ্টি নামে কী কষ্টের আবেগে!
যদিও জানি অমর তুমি আছো চিরঞ্জীব
বাংলাদেশের হৃদয় তুমি মহান শেখ মুজিব।

শেখ মুজিবুর

দীদার মাহদী

তীব্র শ্লেষ রুদ্র কণ্ঠে
ভাষণ শোনার পর,
বাঙালিদের মনের থেকে
কেটে গেল ডর।

ভাষণ শুনে বীরের জাতির
রক্ত গরম হয়,
বিপ্লবী মন চাঙা করে
ছিনিয়ে আনে জয়।

সবার মনে জায়গা করে
ভাষণ দিয়ে এক,
শেখ মুজিবুর নামটা এখন
চতুর্দিকে দেখ।

তর্ক আছে থাকুক অনেক
আজ সে বেঁচে নেই,
তার জীবনী পড়ে দেখি
নেতা ছিলেন সেই।

প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু

ইদ্রিস মন্ডল

প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবের নাম
উচ্চারিত হলে সাহসের
যাই বেড়ে উদ্দাম

বুকের ভিতর শক্তি আসে
আর থাকে না ভয়
এমন নেতার এক ভাষণে
দেশ সৃষ্টি হয়

বিরাট নেতা
স্বাধীনচেতা
ভাষণের যা বুলি
শত্রু শুনে ভয়ে পালায়
এটম বোমার গুলি।

বঙ্গবন্ধুর ঈদ

মো. ইকবাল হোসেন

বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শৈশব থেকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই তো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি স্বপ্ন দেখতেন ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের। তাঁর জীবন দেশের আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো ছিল না। জীবনের প্রায় ১৩ বছর জেলে কেটেছে। এ কারণে অনেক সময় পরিবারের সাথে ঈদ পালন করার সুযোগ তেমন পাননি। বঙ্গবন্ধুর অনেক ঈদ কেটেছে জেলের ভেতর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৭ সালে জেলে ঈদুলফিতর ও ঈদুল আযহা পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর লেখা 'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ে তিনি লিখেছেন, '১১ তারিখে রেণু এসেছে ছেলে-মেয়ে নিয়ে দেখা করতে। আগামী ১৩ই জানুয়ারি ঈদের নামাজ। ছেলে-মেয়েরা জামাকাপড় নেবে না। ঈদ করবে না, কারণ আমি জেলে। ওদের বললাম, তোমরা ঈদ উদযাপন কর।'।

বঙ্গবন্ধু ১৯৬৭ সালের দু বছর পর ১৯৬৯ সালে গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় গিয়েছিলেন ঈদ পালন করতে। তখন তাঁর মা সায়েরা খাতুন অসুস্থ ছিলেন। কবি ও লেখক নির্মলেন্দু গুণ লিখেছেন, '২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে তিনি গ্রামের বাড়িতে অবস্থানরত তাঁর অসুস্থ মায়ের সঙ্গে ঈদ পালন করার জন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যান। তেত্রিশ মাস একনাগাড়ে কারাবন্দি থাকার কারণে বিগত ছয়-ছয়টি ঈদ উৎসবের আনন্দ থেকে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বঞ্চিত থেকেছে। অনেকদিন পর বঙ্গবন্ধুর পরিবারে ফিরে এসেছে ঈদের আনন্দ। ঐ পরিবারের ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের মানুষের মনে।'

দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করা বঙ্গবন্ধুর অনেক সময় কেটেছে সাধারণ জনগণের সঙ্গে। সেজন্য পরিবার-পরিজনের সাথে তেমন সময় কাটাতে পারেননি। তাই যে-বার তিনি পরিবার- পরিজনের সঙ্গে ঈদ পালন করতেন তখন পরিবারে খুশির জোয়ার বয়ে যেত।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ঈদ পালন করেন। বেশিরভাগ সময় তিনি ধানমন্ডি মাঠে ঈদের নামাজ পড়তেন। তখন তিনি কোনো প্রটোকল

রাখতেন না। সাধারণ মানুষের সাথে ঈদের নামাজ পড়তেন। নামাজ শেষে উপস্থিত মানুষজন তাঁর সাথে কোলাকুলি করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করত। সবার সঙ্গে ঈদ আনন্দ ভাগ করে নিতেই বঙ্গবন্ধু ভালোবাসতেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে ঈদ উদযাপন ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতার পতাকা পতপত করে উড়ছে। বাঙালিরা ভেঙে ফেলেছে পরাধীনতার শেকল। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে, দেশ গড়ার কাজ করছেন বঙ্গবন্ধু পুরোদমে। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে লিখেছিলেন, ঈদুল আজহা আমাদের আত্মত্যাগের আদর্শ শিক্ষা দেয়। বাংলাদেশের সাহসী মানুষ দেশকে স্বাধীন করার জন্য সম্পদ ও রক্ত দিয়ে চরম আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি চরম আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে ঈদুল আজহা উদযাপন করার আহবান জানিয়েছিলেন সে সময়। ❑

তথ্যসূত্র : বিভিন্ন পত্রপত্রিকা

প্রাবন্ধিক

যারা বেঁচে গিয়েছিলেন সেদিন

মো. মানিক হোসেন চৌধুরী

জাতীয় শোকের দিন। বাংলার আকাশ-বাতাস আর প্রকৃতিও অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন। এই দিনে আগস্ট আর শ্রাবণ মিলেমিশে একাকার হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর রক্ত আর আকাশের মর্ম ছেঁড়া অশ্রুর প্লাবণে। পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট সুবেহ সাদিকের সময় যখন ধানমন্ডি

৩২ নম্বরে নিজ বাসভবনে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে বুলেটের বৃষ্টিতে ঘাতকরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। তখন যে বৃষ্টি ঝরছিল, তা যেন ছিল প্রকৃতির কান্না। ঘাতকদের উদ্যত অস্ত্রের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল শোকে আর অভাবিত ঘটনার আকস্মিকতায়। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের এমনকি শিশুদেরকেও হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির পাশাপাশি হামলা চালানো হয় শেখ ফজলুল হক মনি ও আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে। হত্যা করা হয় তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের। তবে সেদিনের সেই বিভীষিকাময় রাতে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন কয়েকজন।

হত্যাকাণ্ডের দিন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ছিলেন বেলজিয়ামে। হত্যাকাণ্ডের পর সেদিনই তাদেরকে নিরাপদে জার্মানিতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন জার্মানিতে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী। বিদেশে থাকার কারণে প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা। সেই রাতে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতেই ছিলেন আ.ফ. ম. মহিতুল আলম মুহিত। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী। পরবর্তীতে তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বাদী। রহীম শাহ সম্পাদিত পঁচাত্তরের সেই দিন বইয়ে 'কাছ থেকে দেখা সেই হত্যাকাণ্ড' নামে একটি লেখায় সেই ভয়াবহ রাতের কথা স্মরণ করেছেন

মহিতুল আলম। সেদিন রাতে তিনিও বুলেটবিদ্ধ হয়েছিলেন। শেখ কামালের দেহ ফুঁড়ে বেরিয়ে একটি বুলেট লেগেছিল মহিতুল আলমের হাঁটুতে। তবে ঘাতকদের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যান তিনি।

একই সময়ে হামলা করা হয় বঙ্গবন্ধুর ভাগনে শেখ ফজলুল হক মনির বাড়িতে। হত্যা করা হয় শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্তা স্ত্রী বেগম আরজু মনিকে। সেই সময় ওই বাড়িতেই ছিলেন শেখ মনির ভাই শেখ ফজলুল করিম সেলিম। শেখ মনিকে গুলি করা হলে শেখ সেলিমও মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয় তার শরীর। তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায় ঘাতকরা। শেখ সেলিমের স্ত্রীও ছিলেন সেই বাড়িতে। সেদিন শেখ মনির বাড়িতে আরো ছিলেন তাঁর মা শেখ আছিয়া বেগম ও বাবা শেখ নূরুল হক। শেখ আছিয়া বেগম ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বড়ো বোন। আরো ছিলেন শেখ মনির দুই ছেলে। বড়ো ছেলে শেখ ফজলে শামস পরশ ও ছোটো ছেলে শেখ ফজলে নূর তাপস। তখন পরশের বয়স ছিল ৫ বছর আর তাপসের ৩ বছর। ওই বাড়িতেই ছিলেন শেখ মনির ছোটো ভাই শেখ মারুফ। পরশ, তাপস ও শেখ মারুফ লুকিয়ে থাকায় বেঁচে গিয়েছিলেন।

২৭ নম্বর মিন্টো রোডের বাড়িতে থাকতেন মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সেজ বোনের স্বামী। সেই বাড়িতে হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয় আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার স্ত্রী, ১৪ বছরের মেয়ে বেবী, ১০ বছরের ছেলে আরিফ ও সাড়ে চার বছর বয়সের নাতি বাবুকে। বেঁচে যান আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ছেলে আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও মেয়ে হামিদা সেরনিয়াবাত। সেই কালরাতে ঘাতকের হাত থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিলেন পরবর্তীতে তাদের জন্য বেঁচে থাকাটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। আপনজনদেরকে হারিয়ে তারা হয়ে পড়েছিলেন নিঃস্ব, হতবিহবল। ❑

প্রাবন্ধিক

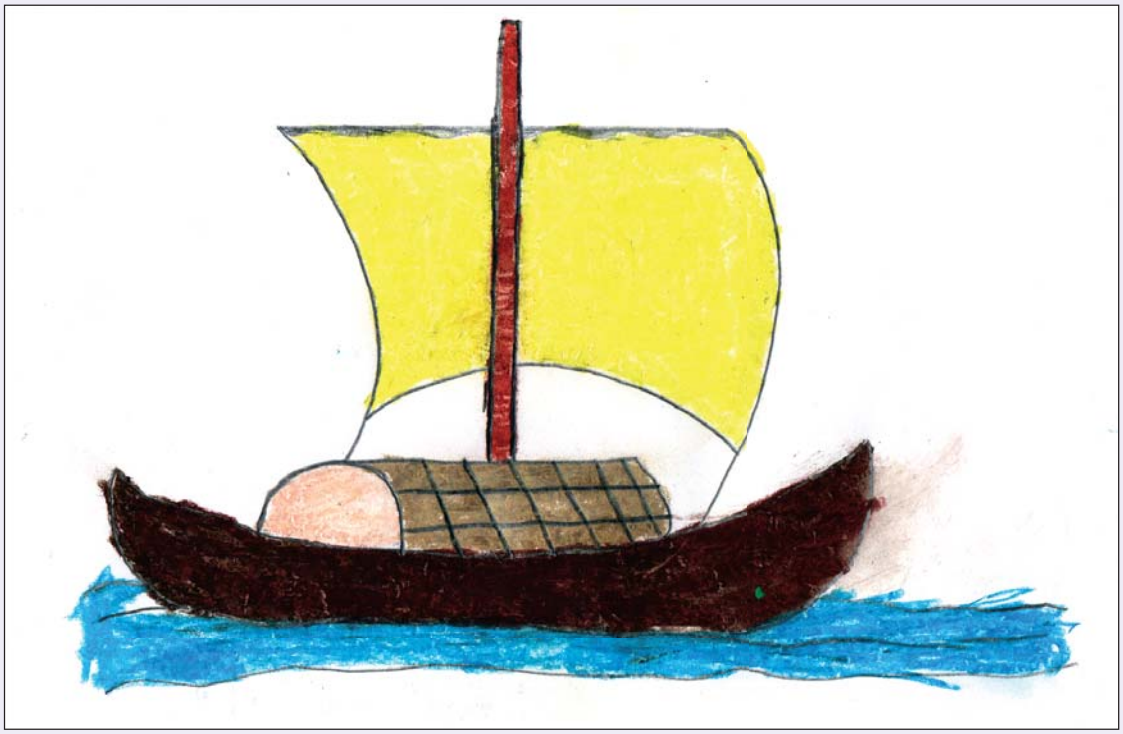

মো. আমিনূর সরকার সামি, তৃতীয় শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ

ইতিহাসের সাক্ষী একটি চেয়ার

কামরুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন। স্বাধীন ভূখণ্ডের প্রথম আচার্য হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ দেওয়ার কথা ছিল। মনোরম সাজে সাজানো হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনা। টিএসসির অনুষ্ঠান মঞ্চও ছিল পুরোপুরি প্রস্তুত। কাঠের ফ্রেমে ফোম বসানো নতুন একটি চেয়ারও বানানো হয়েছিল, যে চেয়ারে এসে বসবেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু সেই চেয়ারে তাঁর আর বসা হলো না।

একটি চেয়ার। একটি ইতিহাস। তৈরিতে ছিল কারিগরি প্রযুক্তির ছোঁয়া। শত আবেগে সুনিপুণভাবে তৈরি করা হয়েছিল চেয়ারটি। জাতির কর্ণধারকে সরাসরি দেখার স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়া। একটি বিদ্যাপীঠের 'বিশেষ মর্যাদা' না পাওয়ার আক্ষেপ জাতির রয়েই গেল। বলছিলাম, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) তৈরি চেয়ারটির কথা। এদিন স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সমাবর্তনের আয়োজন করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে প্রথম কোনো রাষ্ট্রপতির আগমন। তাই জাতির পিতার বসার জন্য বানানো হয়েছিল একটি চেয়ার। কিন্তু শত আবেগ ও ভালোবাসা চূর্ণ হয়ে যায় ১৫ই আগস্ট ভোরে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আর যাওয়া হয়নি প্রিয় ক্যাম্পাসে। বসা হয়নি শত আবেগের সংমিশ্রণে তৈরি চেয়ারে। বিশেষ মর্যাদা পায়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শতাব্দীর

চার দশক পেরিয়ে আজও চেয়ারটি সে দিনটির সাক্ষী হয়ে রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) তৃতীয় তলায় সংরক্ষিত রয়েছে চেয়ারটি। টিএসসির পরিচালক মহিউজ্জামান চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে চেয়ারটি সংস্কারে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

নতুনভাবে লাগানো হয়েছে কাভার। করা হয়েছে বাইন্ডিং। বঙ্গবন্ধু আসবেন বলে ১৪ই আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। পুরো টিএসসির জুড়ে ছিল সাজ সাজ রব। টিএসসি অডিটোরিয়াম ছাড়াও বাইরের মাঠ এবং সুইমিং পুলেও বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৫ই আগস্ট এই চেয়ারটিতে বসার কথা ছিল বঙ্গবন্ধুর। চেয়ারটির কাজ শেষ হয় আগের দিন। পরের দিন সকালে টিএসসি এলাকায় শুধু ট্যাংক আর ট্যাংক। ভীতিকর এক পরিবেশ। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি আর আসলেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে আলাদা মর্যাদা দেয়ার কথা ছিল তাও আর হলো না।

বর্তমানে চেয়ারটি একটি গ্লাস ঘেরা বক্সে সংরক্ষিত আছে টিএসসির তৃতীয় তলায়। যাতে করে নতুন প্রজন্ম চেয়ারটি সম্পর্কে জানতে পারে। এতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের ইতিহাস ফুটে উঠবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ছিন্ন হবার নয়। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঢাবিতে তাঁর আগমণের কথা ছিল। এদিন এসে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো ঢাবিকেও জাতীয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। যদি সে (বঙ্গবন্ধু) মর্যাদা দিতে পারতেন তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব দরবারে আরো ভালো অবস্থানে চলে যেত। কিন্তু তিনি সে সুযোগ পাননি। ঘাতকরা তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করল। ❑

প্রাবন্ধিক

আগস্ট মাসে

সামিউল ইসলাম

কাঁদে পাখি ঝরে আঁখি
নুইয়ে পড়ে জল
হৃদয় কোণে ব্যথার জোয়ার
বইছে অবিরল।

ফুল ও ফলে কানন তলে
পড়ছে ঝরে খুব
বঙ্গ নীড়ে আঁধার ঘিরে
আলো দিলো ডুব।

মানুষ কাঁদে নদী কাঁদে
কাঁদে নদীর ঢেউ
ভীষণ ব্যথায় জর্জরিত
শাপলা,শালুক সেও।

আগস্ট মাসে স্মৃতি ভাসে
শোকাহত সব
ফুল পাখিদের কিচিরমিচির
নেই যে কলরব।

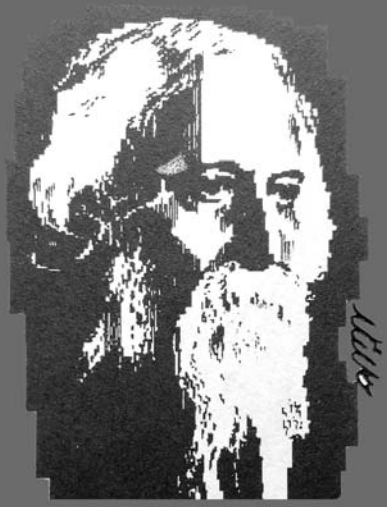

রবীন্দ্রনাথ

গোলাম নবী পান্না

লেখার কথা ভাবি যখন
সামনে যেন দাঁড়িয়ে–
স্মৃতির পাতায় এলেই কবি
দেন দু'বাহু বাড়িয়ে।

কবি তো ঠিক আসেন না তাই
বইগুলো তাঁর নাড়িয়ে
লেখার বহর দেখেই যেন
ধারণা যায় ছাড়িয়ে।

এ দেখি এক সমুদ্র আর
দিলাম তাতেই পাড়ি-এ
নিজের সাথে চলছে নিজের
অন্যরকম আড়ি-এ।

কোন্‌টা ধরি কোন্‌টা ছাড়ি
সব লেখা তাঁর দামই যে
গল্প, ছড়া, উপন্যাসে
জড়িয়ে আছে নামই যে।

আরো আছে গান, কবিতায়
পড়ি অবিরামই যে
'রবীন্দ্রনাথ' বলেই তিনি
লিখি স্মরণ-খামই যে।

জীবন জুড়ে কবি নজরুল

সুমন বনিক

আকাশটাকে ভরে দিলেন শত গানের ফুলে
তারার ফুল গুঁজে দিলো কে কালো খোঁপার চুলে
জল তরঙ্গে ঝিলিমিলির হৃদয়ে ঢেউ তোলে
কোন কাননে বনফুলেরা ছন্দে-তালে দোলে।

সে কবি যে প্রেমের কবি ভলোবাসার ছবি

এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো মন্দির কাবা নাই
মিথ্যে কথা শুনেনি সে, বলেন সত্য তাই
একই বৃন্তে কুসুম দুটি এক মাটিতে ঠাঁই
কবিতায় ফুল ফুটিয়ে হিন্দু মুসলিম ভাই।

সে কবি যে সাম্যের কবি মেঘলা দিনের রবি

কাব্যের দেহে টগবগ করে শেকল ভাঙার গান
রণে ক্লান্ত হবে শান্ত জেগে ওঠে প্রাণ।
এক হতে তাঁর বাঁশের বাঁশি আর যে রণ তূর্য
আঁধার চিরে আনেন কবি নতুন ভোরের সূর্য।

সে কবি যে দ্রোহের কবি আগুন জ্বালায় সবই

'মৃত্যুক্ষুধা' জ্বলছে বুকে বাজছে 'বিষের বাঁশি'
সঙ্কটে তাই কবির কাছে বারবার ফিরে আসি।
উজান ভাটির টানে জীবন চলে পাশাপাশি
সাম্যে-দ্রোহে প্রেম-যৌবনে নজরুল ভালোবাসি।

সে কবি যে বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের কবি

ছোটোদের ছড়া

আগস্ট এলে

আরিফা আক্তার

আগস্ট মাস এলে
কেঁদে ওঠে সকলের প্রাণ
তাঁর শোকেতে গায় সবাই
কষ্ট শোকের গান।

হায়নার বুলেটে আঘাতে
কেড়ে নিল বঙ্গবন্ধুর প্রাণ
স্মরণে বরণে থাকবেন তিনি
হয়ে চির অম্লান।

সপ্তম শ্রেণি, মাগুরা হাই স্কুল
নীলফামারি

শেখ মুজিব

মুহিবুল হক

শেখ মুজিবুর রহমান
কৃষকের মুখের হাসি
রাখাল বাজায় বাঁশি।
এক দুরন্ত কিশোর,
মা, মাটি ও মাতৃভূমি
তোমার ডাকেতে গর্জে উঠল
সোনার বাংলাদেশ
জাতির পিতা তুমি,
অমর অবিস্মরণীয়
উজ্জ্বল নক্ষত্র তুমি
এই ধরার মাঝে
কালের সাক্ষী আজও।

দশম শ্রেণি,
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়
মতিঝিল

বঙ্গবন্ধু

তুর্ণ আলম

শুনলো সবাই মিলে
বঙ্গবন্ধুর কথা
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে
আনলো প্রিয় স্বাধীনতা

দেশ ও জাতি সবার কাছে
তিনি অনেক প্রিয়,
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়
থাকবেন হয়ে স্বরণীয়।

সপ্তম শ্রেণি, মাইলস্টোন স্কুল, উত্তরা, ঢাকা

শ্রেষ্ঠ সন্তান

মানতাকা তাবাসসুম গুড়িয়া

বাংলাদেশকে স্বাধীন করে
নিয়েছেন সবার হৃদয়ে স্থান
তিনি বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পৃথিবীর ফুলের বাগানে তিনি ছিলেন
প্রস্ফুটিত প্রিয় এক ফুল
১৫ই আগস্ট কালরাতে তাঁকে হত্যা করে
ঘাতকেরা করেছে ভুল।

এই জগতে বাংলা ও বাঙালি
বেঁচে থাকবে যতদিন
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তাঁকে
সম্মান ও স্মরণ করবে ততদিন।

দশম শ্রেণি, চিলাহাটি মার্চেন্টস হাই স্কুল, নীলফামারি

কিংবদন্তীদের চোখে বঙ্গবন্ধু

শাহানা আফরোজ

সমগ্র বাঙালি জাতি এবং বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত মানুষের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বুকে ছিল অসীম সাহস। শোষণ-বঞ্চনায় মানুষের ব্যথায় তাঁর হৃদয় কেবলই কেঁদে উঠত। অন্যায় ও অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর এমন ছিল যে মৃত্যুভয়ও তাঁকে কুণ্ঠিত করতে পারেনি। জেল-জুলুম নিপীড়নের শাসকগোষ্ঠী শেখ মুজিবকে দমাতে পারেনি।

১৯৭১ সালে অসংখ্য বাঙালির মতোই বেশ কিছু বিদেশি নেতা ও কবি-সাহিত্যিক ছিলেন যারা বিশ্বাস করতেন শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বেই এই দেশ স্বাধীন হবে। এলেন্স গিন্সবার্গ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অনডিউটি ইন বাংলাদেশ' গ্রন্থে মূল্যায়ন করে এভাবে লিখেছেন: 'এমন একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে যে অনগ্রসর বাঙালি জাতিকে মুক্তির আস্বাদ দিবে। তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান।'

ফ্রান্সের বিখ্যাত সাহিত্যিক আঁদ্রে মালরো বলেন, 'স্টালিন নয়, হিটলার নয়, মাওসেতুং নয় মহত্মা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমানকে যদি জগৎ এখনো না বুঝে থাকে, না বুঝে থাকে এঁদের মতের মর্মবাণী, তবে সময় এসেছে এ বিষয়ে দৃষ্টি উন্মোচনের।'

ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট (১৯৭২ সালে এক সাক্ষাৎকারে) বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার শক্তি কোথায়? তিনি অপকটে সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ' আমি আমার জনগণকে ভালোবাসি।' সাংবাদিক

আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার দুর্বল দিকটা কী?' বঙ্গবন্ধু সে প্রশ্নের জবাবেও বলেছিলেন, 'আমি আমার জনগণকে খুব বেশি ভালোবাসি।' বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন।

তৎকালীন বিশ্বমিডিয়াও তাকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল।

'শেখ মুজিবকে চতুর্দশ লুই-এর সাথে তুলনা করা যায়। জনগণ তার কাছে এত প্রিয় ছিল যে লুই-এর মতো তিনি এ দাবি করতেই পারেন আমিই রাষ্ট্র।' –পশ্চিম জার্মানি পত্রিকা।

প্রভাবশালী ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ানের মতে, 'শেখ মুজিব ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব।'

ফিনান্সিয়াল টাইমস বলেছে, 'মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ কখনোই জন্ম নিত না।'

'মুজিব হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না, যারা মুজিবকে হত্যা করেছে তারা যে-কোনো জঘন্য কাজ করতে পারে।'–নোবেল বিজয়ী উইলিবান্ট।

'শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বিশ্বের শোষিত মানুষ হারাল তাদের একজন মহান নেতাকে, আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বিশাল হৃদয়ের বন্ধুকে।' –ফিদেল কাস্ট্রো।

'শেখ মুজিব নিহত হবার খবরে আমি মর্মাহত। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন। তার অনন্য সাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল।' -ইন্দিরা গান্ধী।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রথম শহিদ। তাই তিনি অমর।' – সাদ্দাম হোসেন।

'বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশই শুধু এতিম হয়নি বিশ্ববাসী হারিয়েছে একজন মহান সন্তানকে।' –জেমসলামন্ড, ইংলিশ এম পি। 'তোমরা আমার প্রিয়বন্ধু মুজিবকে হত্যা করলে! আমারই দেওয়া ট্যাংক ব্যাবহার করে! আমি নিজেকেই অভিশাপ দিচ্ছি, কেন আমি তোমাদের ট্যাংক দিয়েছিলাম?'–আনোয়ার সাদাত (মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট)।

'শেখ মুজিব নিহত হলেন তাঁর নিজেরই সেনাবাহিনীর হাতে অথচ তাঁকে হত্যা করতে পাকিস্তানিরা সংকোচবোধ করেছে।' –বিবিসি- ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫।

ভারতীয় বেতার 'আকাশ বাণী' ১৯৭৫ সালের ১৬ই আগস্ট তাদের সংবাদ পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে বলে, 'যিশু মারা গেছেন। এখন লক্ষ লক্ষ লোক ক্রুশ ধারণ করে তাকে স্মরণ করছে। মূলত একদিন মুজিবই হবেন যিশুর মতো।'

একই দিনে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক শেখ মুজিবের জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করে।'

ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেছিলেন : 'আমি হিমালয় দেখিনি, তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তি ও সাহসে এ মানুষটি হিমালয়ের সমতুল্য।'

মানবতাবাদী মনীষী লর্ড ফেনার ব্রোকওয়ে আরো একধাপ এগিয়ে দেখেছেন এভাবে : 'জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধী, ডি ভ্যালেরার চেয়েও শেখ মুজিব এক অর্থে বড়ো নেতা। শেখ মুজিবের সাহসিকতা ও ব্যক্তিত্ব কেবল দক্ষিণ এশিয়া নয় সারাবিশ্বে বিরল।'

একারণেই তিনি বিশ্বনেতা। সমগ্র বাঙালি জাতির নেতা। তিনি শুধু বঙ্গের বন্ধু নন, সারা বিশ্বেরও বন্ধু। ❑

শিশুর তিন পর্বতারোহণ

বয়স সবে মাত্র পাঁচ বছর। নাম তার সেরেন প্রাইস। এই পাঁচ বছরের শিশুটি এরই মধ্যে ৪৮ ঘণ্টারও কম সময়ে যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ তিনটি পর্বত চূড়ায় আরোহণ করে সর্বকনিষ্ঠ পর্বতারোহণকারীর খেতাব অর্জন করেছে। সেরেন প্রাইস বসবাস করে যুক্তরাজ্যের ওয়েলসের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কারমারদেনশায়ারে বাবা মায়ের সাথে। বাবা গ্লিন প্রাইসের (৪৪) সঙ্গে সে এখন মরক্কোর তুবকাল পর্বতের চূড়ায় আরোহণের পরিকল্পনা করছে। এর উচ্চতা চার হাজার ১৬৭ মিটার বা ১৩ হাজার ৬৭১ ফুট। সেরেন গত বছর তার বাবার সঙ্গে স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের সর্বোচ্চ পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করেছিল। মাত্র তিন বছর বয়সে ওয়েলসের তিনটি সর্বোচ্চ পর্বতে আরোহণ করে সেরেন।

গত বছরের ডিসেম্বরে পাঁচ বছর বয়সে সে বাবার সঙ্গে স্কটল্যান্ডের বেন নেভিস, যুক্তরাজ্যের স্ক্যাফেল পাইক এবং ওয়েলসের ইয়ার ওয়াইডফাতে (স্নোডন নামেও পরিচিত) আরোহণ করে। তিন পর্বতে প্রায় ২৩ মাইলের (৩৭ কিলোমিটার) এই চ্যালেঞ্জিং যাত্রায় তার প্রিয় মুহূর্তগুলোর অন্যতম ছিল পর্বতের নয়নাভিরাম দৃশ্য ও বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকা। বাবা ও সে পর্বতারোহণে গিয়ে একটি হাসপাতালের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে। তারা হাসপাতালটির জন্য সাত হাজারেরও বেশি ইউরো সংগ্রহ করেছে। বড়ো হয়ে চিকিৎসক ও রকস্টার হতে চায় সেরেন। ❑

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

পদ্মা সেতুতে বিশ্বকাপ ট্রফি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশ্বকাপের ট্রফি ঘুরে বেড়ায়। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশে এসেছে এই ট্রফি। ৬ই আগস্ট মধ্যরাতে ঢাকায় আসে ট্রফি। আর ৭ই আগস্ট বৃষ্টিস্নাত দিনে ট্রফির ফটোসেশন হলো স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে। পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তের ১ নম্বর পিলারের পাশে বিকেল সাড়ে ৪টায় শুরু হয় এই ফটোসেশন। ট্রফিটি দেখতে সেতুর মাওয়া প্রান্তে অনেক মানুষ ভিড় করেন। তারা বৃষ্টি উপেক্ষা করে ট্রফি দেখতে হাজির হন। আইসিসির চাওয়া যে দেশে ট্রফিটি যাবে সেই দেশের দর্শনীয় স্থানে ফটোসেশন করা হবে। সেই হিসেবে পদ্মা সেতুতে ফটোসেশন করার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু এখন দেশের অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

আগামী ৫ই অক্টোবর ভারতে শুরু হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের আসর। ভারতে খেলা হওয়ায় বড়ো স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। সেই স্বপ্নের শুরুটা বাংলাদেশ করছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু দিয়ে। গত ২৭শে জুন আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপ ট্রফি ভূপৃষ্ঠ থেকে এক লাখ ২০ হাজার ফুট উচ্চতায় মহাশূন্যে

উন্মোচন করে। ভারত, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান ট্যুর করেছে বিশ্বকাপের ট্রফি। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে আসে ট্রফি। ঢাকায় তিন দিন থাকবে বিশ্বকাপের এই ট্রফিটি।

পদ্মা সেতুতে ফটোসেশনের পর ট্রফিটি রাখা হয় রাজধানীর একটি হোটেলে। ৮ই আগস্ট সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত জাতীয় দলের সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটার, নারী দলের ক্রিকেটার, বিসিবি পরিচালক, বিসিবির কর্মকর্তা-কর্মচারী, ক্রিকেট সংগঠক ও ক্রীড়া সাংবাদিকদের ট্রফির সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ পায় মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ৯ই আগস্ট শেষ দিন সাধারণ দর্শকদের জন্য ট্রফিটি রাখা হয় বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে। এদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ট্রফির ছবি তুলে ভক্তরা। এর জন্য কোনো টিকিট কিনতে হয় না। বাংলাদেশ থেকে ট্রফি যাবে কুয়েতে। সব মিলে মোট ১৮টি দেশে ঘুরবে ট্রফিটি। ❑

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

নেচে বিশ্ব রেকর্ড

মাত্র ১৬ বছর বয়সি এক কিশোরী টানা ১২৭ ঘণ্টা নৃত্য পরিবেশন করে বিশ্ব রেকর্ড করেছে। টানা পাঁচ দিনের পরিশ্রমে সে এই কীর্তি গড়ে। এর মধ্য দিয়ে সে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে এককভাবে সবচেয়ে বেশি সময় নৃত্য করার কীর্তি নিজের করে নিয়েছে। এই কিশোরীর নাম শুষ্টি সুধীর জাগতপ। বাড়ি ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে। শুষ্টি গত ২৯শে মে সকালে তার নৃত্য শুরু করে, যা চলে ৩রা জুন বিকেল পর্যন্ত। এই কীর্তি গড়তে শুষ্টি বেছে নেয় ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য 'কত্থক'। ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরতেই সে এটা বেছে নেয়।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের বিচারক (অ্যাডজুডিকেটর) স্বপ্নিল ডাঙ্গারিকর গণমাধ্যমকে বলেন, শুষ্টি তার কলেজ মিলনায়তনে এই ম্যারাথন নৃত্য করে। দীর্ঘ সময় ধরে নৃত্য করতে গিয়ে সে কয়েকবার খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার মা-বাবা সব সময় তার পাশেই ছিলেন। তাকে উজ্জীবিত করতে তাঁরা তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিতেন। সামগ্রিকভাবে নৃত্যের পুরো বিষয় ছিল চিত্তাকর্ষক। অনুষ্ঠানস্থল ছিল তার সমর্থকে ঠাসা।

শুষ্টি হুট করে এই কীর্তি গড়তে পারেনি। এর জন্য তাকে করতে হয়েছে কঠোর সব অনুশীলন। সে ১৫ মাস ধরে যোগনিদ্রা ও দাদার শেখানো ধ্যানের মাধ্যমে মস্তিষ্ককে উজ্জীবিত, গভীর ঘুম ও ক্লান্তি রোধের কৌশল রপ্ত করেছে। প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা ঘুমানোর লক্ষ্যে চার ঘণ্টা ধ্যান, ছয় ঘণ্টা নৃত্য ও তিন ঘণ্টা ব্যায়াম অনুশীলন করেছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে কীর্তি গড়ার আগে শুষ্টি বাড়িতে ১২৬ ঘণ্টা করে দুবার ম্যারাথন নৃত্য অনুশীলন করেছিল। ওই সময় নিজেকে সতেজ রাখতে সে নারিকেলের পানি ও চকলেট খেয়েছিল। কঠোর অনুশীলনের কারণে শরীর ও মনের সব পরিবর্তনের সঙ্গে পরিচিত ছিল সে। তাই শেষ অবধি শান্ত ও সুরক্ষিত ছিল শুষ্টি। এই কীর্তি গড়ার পর সে টানা এক দিন ঘুমিয়েছিল।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের নিয়ম অনুযায়ী এমন ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি তার প্রতি ঘণ্টার কাজের জন্য পাঁচ মিনিট করে বিরতি পেয়ে থাকেন। শুষ্টি অধিকাংশ সময় তার বিরতি নিত মধ্যরাতে। এ সময় সে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিল অথবা মস্তিষ্ক সতেজ করতে মা-বাবার সঙ্গে কথা বলেছিল। উল্লেখ্য, তার আগে এই কীর্তির অধিকারী ছিলেন নেপালি নৃত্যশিল্পী বন্দনা নেপাল। তিনি ২০১৮ সালে ১২৬ ঘণ্টা নেচেছিলেন। ❑

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন সচেতনতা

ডেঙ্গু জ্বর একটি এডিস মশা বাহিত ভাইরাস জনিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ। এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণের তিন থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সচরাচর ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গগুলো দেখা দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথমবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর বিশেষ কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা যায় না। শুধু অল্প কিছু ক্ষেত্রেই রোগের প্রভাব গভীর হয়। ডেঙ্গুর সাধারণ উপসর্গগুলো হলো : উচ্চ জ্বর (১০১ থেকে ১০৩ ডিগ্রি), তীব্র মাথার যন্ত্রণা, চোখের পিছনে ব্যথার অনুভূতি, মাংসপেশি এবং অস্থি-সন্ধিতে যন্ত্রণা , বমিভাব, মাথাঘোরা, গ্রন্থি ফুলে যাওয়া ও ত্বকে বিভিন্ন স্থানে ফুসকুড়ি ।

এই উপসর্গগুলো রোগ সংক্রমণের ৪ থেকে ১০ দিনের মধ্যে দেখা দেয়। সাধারণত ২ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত উপসর্গ স্থায়ী হতে পারে। দ্বিতীয়বার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে রোগের ভয়াবয়তা বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে পূর্বে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত সতর্কতা মেনে চলতে বলা হয়। ডেঙ্গুর গুরুতর উপসর্গগুলো হলো : প্রচণ্ড পেট ব্যথা, ক্রমাগত বমি হওয়া, মাড়ি বা নাক থেকে রক্তপাত, প্রস্রাবে এবং মলের সাথে রক্তপাত, অনিয়ন্ত্রিত পায়খানা, ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ (যা ক্ষতের মতো দেখাতে পারে), দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস, ক্লান্তি ও বিরক্তি এবং অস্থিরতা।

ডেঙ্গুর জীবাণু মানুষের শরীরের রক্তনালীগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে রক্তনালীতে ছিদ্র তৈরি হয়। রক্ত প্রবাহে ক্লট তৈরির কোষগুলোর (প্ল্যাটিলেট) সংখ্যা কমে যেতে থাকে। এর জন্য মানুষের শরীরে শক লাগা, শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্তপাত,

যে-কোনো অঙ্গের ক্ষতি এবং শেষ পর্যন্ত রোগীর মৃত্যু হতে পারে। রোগীর শরীরে গুরুতর উপসর্গগুলোর কোনো একটি দেখা দিলে অতি অবশ্যই দ্রুত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা উচিত বা রোগীকে নিকটবর্তী হসপিটালে ভর্তি করানো দরকার। অন্যথায় রোগীর প্রাণ সংকট হতে পারে।

স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষের প্লাটিলেট সংখ্যা হয় ১,৫০,০০০ থেকে ৪,৫০,০০০ প্লাটিলেট প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তে। উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ডেঙ্গু-আক্রান্ত রোগীদের এই সংখ্যা ২০,০০০ এর নিচে চলে যেতে পারে। এই সময় রক্তপাতের ঝুঁকি সর্বোচ্চ হয়। মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের প্লাটিলেট সংখ্যা ২১-৪০,০০০/কিউ এমএম-এর মধ্যে থাকে। অবশ্য ডেঙ্গু সংক্রমণে অনেক ক্ষেত্রেই প্লাটিলেট সংখ্যার দ্রুত পরিবর্তন হয়। প্লাটিলেট কাউন্ট কম এবং রক্তক্ষরণের লক্ষণ প্রকাশ পেলে তবেই প্লাটিলেট প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়। অন্যথায় সংক্রমণ কমার সাথে সাথে আমাদের শরীরে স্বাভাবিকভাবে প্লাটিলেট কাউন্ট বৃদ্ধি পায়। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে এবং পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ।

চিকিৎসা : ডেঙ্গুর চিকিৎসার বিশেষ কোনো ওষুধ বা প্রতিষেধক এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। গবেষকরা কাজ করে যাচ্ছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর সংক্রমণ ঘরোয়া চিকিৎসাতেই কমে যায়। চিকিৎসকরা প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিয়ে যন্ত্রণা এবং জ্বরের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেন। নন স্টেরিওডাল প্রদাহ-প্রতিরোধী ওষুধের রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রোগের মাত্রা অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেলে রোগীকে হসপিটালে ভর্তি এবং ডাক্তারি নজরদারিতে রাখা একান্ত জরুরি।

ডেঙ্গু জ্বরের রোগীদের জন্য ডায়েট : ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তদের জন্য কিছু পুষ্টি উপাদান বিশেষভাবে উপকারী হতে পারে, যেমন- ভিটামিন সি (সাইট্রাস ফল, বেরি এবং শাকসবজিতে পাওয়া যায়), জিঙ্ক (সামুদ্রিক খাবার, মটরশুঁটি এবং বাদামে পাওয়া যায়) আয়রন (মাংস, মটরশুঁটিতে পাওয়া যায়),ওটমিল (সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট এবং ফাইবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ) পেঁপে। সেইসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা এবং ডাবের পানি খাওয়া দরকার শরীরকে হাইড্রেট করার জন্য।

ডেঙ্গু হলে যেসব খাবার খাওয়া নিষেধ : সহজে হজম হয় না এমন খাবার ডেঙ্গু রোগীদের খাওয়া উচিত নয়। যেমন - আমিষ খাবার, চর্বি বা তৈলাক্ত খাবার ,ভাজাভুজি ইত্যাদি।

বন্ধুরা, ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ৫টি নির্দেশনা তোমাদের সবাইকে জানিয়ে দিলাম–

১. সবাইকে মশারি ব্যবহার করতে হবে।

২. বাসাবাড়ি, ফ্ল্যাট, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয়, হাসপাতাল ও কমিউনিটি সেন্টারসহ সব চিকিৎসাকেন্দ্র, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন প্রভৃতি জায়গার কোথাও যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও মশামুক্ত রাখতে হবে।

৪. নিজে সচেতন থাকার পাশাপাশি শহর, গ্রামগঞ্জ, পাড়া-মহল্লা ও হাট-বাজারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।

৫. সব এলাকায় মশক নিধন অভিযান চালাতে হবে।

ডেঙ্গু জ্বর একটি সাধারণ রোগ। কিন্তু অবহেলা করলে এই রোগ মারাত্মক হতে পারে। শহরাঞ্চলে এর প্রকোপ বেশি। তাই নগরবাসীকে আরেকটু সজাগ ও সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে যাদের ডেঙ্গু হয়েছে তাদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে। দ্বিতীয় ডেঙ্গু সংক্রমণ মারাত্মক হতে পারে। তোমরা সচেতন থাকো, সুস্থ থাকো এবং ভালো থাকো। ❑

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

গ্লোবাল স্কুল মিলস কোয়ালিশন

বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে 'গ্লোবাল স্কুল মিলস কোয়ালিশন'-এ যোগ দিয়েছে । বাংলাদেশ ৮৫তম দেশ হিসেবে এবার যোগদান করেছে। 'গ্লোবাল স্কুল মিলস কোয়ালিশন' হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরে 'স্কুল মিল' চালু কার্যক্রম। এর ফলে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরে 'স্কুল মিল' চালু কার্যক্রম আরও বেগবান হবে। ২৪শে জুলাই ইতালির রোমে জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ফুড সিস্টেম সামিটের উদবোধন অধিবেশন। সেখানে বাংলাদেশের পক্ষে কোয়ালিশনের কমিটমেন্ট ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করে আসছে। ২০২২ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্যপীড়িত এলাকায় ১০৪টি উপজেলার ৩০ লাখেরও বেশি শিশুকে পুষ্টিকর বিস্কুট সরবরাহ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে-এর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৪.২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার ৭.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এ কর্মসূচির অভাবনীয় সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সরকার আগামী ৩ বছরে ১৫০ উপজেলার ২০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫ লাখেরও বেশি শিশুর মাঝে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছে। নতুন এ কর্মসূচিতে পুষ্টিকর বিস্কুটের পাশাপাশি মৌসুমী ফল, ডিম, দুধ, প্রভৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রতিবন্ধী আমিনুলের আঁকা ছবি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ - এর শুভেচ্ছা কার্ডে স্থান পেয়েছে আমিনুল ইসলামের আঁকা একটি ছবি। তিনি সাতক্ষীরার সুইড খাতিমুন্নেসা হানিফ লস্কর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন একজন শিক্ষার্থী। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তাকে এক লাখ টাকার চেক দেওয়া হয়েছে। ৬ই আগস্ট সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রদত্ত এই চেক আমিনুলের হাতে তুলে দেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কাজী আরিফুর রহমান, এডিএম বিষ্ণুপদ পাল, এনডিসি. আব্দুল্লাহ আল আমিন, সুইড খাতিমুন্নেসা হানিফ লস্কর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নাজমা আক্তার ও আমিনুলের মা রোকেয়া বেগম প্রমুখ। বন্ধু আমিনুল ইতোপূর্বে জেলা পর্যায়ের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় একাধিকবার ১ম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

সরকারি উপবৃত্তি

সরকারি উপবৃত্তি হলো একটি সরকারি অনুদান । যেটা শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় সরকার থেকে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দরিদ্র, অচল বা গরিব, প্রতিবন্ধী কোনো শিক্ষার্থী থাকলে তাদের সরকারিভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়। আর এই সহায়তা প্রদান করার নাম মূলত উপবৃত্তি। সরকারি উপবৃত্তির ফলে প্রাথমিকে বেড়েছে শিক্ষার্থী উপস্থিতি। ভবিষ্যতে স্মার্ট প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্যে শতভাগ শিশুকে উপবৃত্তির আওতায় আনতে যাচ্ছে সরকার। এর অংশ হিসেবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী অর্থাৎ প্রায় ৭৮ লাখ শিশু পাচ্ছে এই সুবিধা। যেটাকে মাইলফলক অ্যাখ্যা দিয়ে সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া রুখতে সরকারের এই পদক্ষেপ শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে নতুন এক দিগন্ত। শ্রেণিকক্ষে এখন শিক্ষার্থীদের প্রায় শতভাগ উপস্থিতি। বেড়েছে পাঠ গ্রহণে মনোযোগ।

প্রতিবদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক ছেলের নাম, ৫. বঙ্গবন্ধু যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ৭.বঙ্গবন্ধুর মায়ের নাম

উপর-নিচ: ১. বঙ্গবন্ধু সাত বছর বয়সে যে স্কুল থেকে পড়াশোনা শুরু করেছেন, ২. উপমহাদেশ বিভক্তির পূর্বে ইসলামিয়া কলেজে পড়াশোনার সময় বঙ্গবন্ধু যে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতেন, ৪. বঙ্গবন্ধুর জীবনীকে ভিত্তি করে লেখা হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস, ৬. ১৯৫২ সালে শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু যে যে দেশে গিয়েছিলেন

■	■	■	১.	■	■	■	২.
৩.					■	■	
■	■	■		■	৪.	■	
■	■	■		■		■	
■	■	■	■	■		■	
৫.				■	■	■	
■	■	■	■	■	■	৬.	■
■	৭.						■

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: আমার দেখা নয়াচীন, খাতাকলম, কারখানা, বৃষ, নামকরণ, প্রাচীন, পরিধান, ষড়রিপু

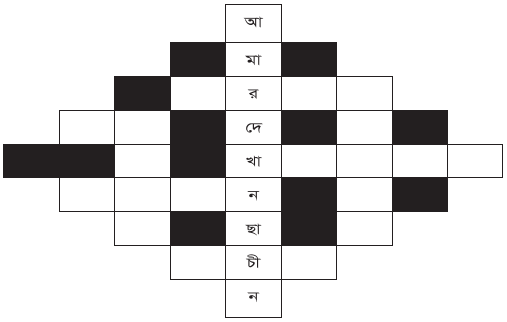

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। 1-81 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৭৩			৭৬		৬২	৩		৫
	৮১		৭৭	৬৪			৭	
		৭৯		৬৫		১		৯
	৬৯		৬৭		৫৯	১৬	১৫	
৪৯	৫০			৫৭				
		৪৬	৫৩		৫৫			১২
৪১		৪৫		৩৩		১৯		২১
	৪৩		৩৫		৩১		২৫	
৩৯		৩৭		২৯		২৭		২৩

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৯	/		-	৭	=	
-	■	*	■	-	■	+
	*	২	-		=	৭
+	■	+	■	+	■	-
২	*		-	৪	=	
=	■	=	■	=	■	=
	/	৫	+		=	৭

জুন মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

বা	নি	য়া	চ	ং			
	দ্রা		তু		কা	ঠু	রে
অ		ব	র	গু	না		খা
বি	ষা	দ			মা		চি
ক		হ	র		ছি		ত্র
ল		জ				সু	
		ম	নো	স	ং	যো	গ
			না			গ	

ছক মিলাও

			সু	প	থ			
		হা		রি		গ		
		স		বে	না	র	সি	
মে	ষ	পা	ল	ক		ম		মা
		তা		বা	ল্য	কা	ল	
		ল		ন্ধ		ল		
			গো	ব	র			

ব্রেইন ইকুয়েশন

৭	*	১	-	৩	=	৪
+		*		+		*
৪	/	২	-	১	=	১
-		+		*		+
২	+	৪	/	২	=	৪
=		=		=		=
৯	-	৬	+	৫	=	৮

নাম্ব্রিক্স

৭৭	৭৬	৭৫	৫০	৪৯	৪৮	৪৭	৪৬	৪৫
৭৮	৭৯	৭৪	৫১	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪
৮১	৮০	৭৩	৫২	৩৯	১০	১১	১২	১৩
৭০	৭১	৭২	৫৩	৩৮	৯	২	৩	১৪
৬৯	৬৮	৫৫	৫৪	৩৭	৮	১	৪	১৫
৬৬	৬৭	৫৬	৩৫	৩৬	৭	৬	৫	১৬
৬৫	৬৪	৫৭	৩৪	২৯	২৮	২৩	২২	১৭
৬২	৬৩	৫৮	৩৩	৩০	২৭	২৪	২১	১৮
৬১	৬০	৫৯	৩২	৩১	২৬	২৫	২০	১৯

m¤§vbx MÖnY i weÁwß

'মাসিক নবারুণ' পত্রিকায় ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে প্রকাশিত লেখার যে-সকল সম্মানিত লেখক সম্মানী গ্রহণ করেননি তাদের নামের তালিকা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে www.dfp.gov.bd এবং নবারুণ ফেইসবুক পেজ Nobarun Potrika-এ প্রকাশ করা হয়েছে। যে-সকল সম্মানিত লেখক উল্লিখিত সময়ে লেখার সম্মানী গ্রহণ করেননি ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে ডিএফপিতে যোগাযোগ করে তাঁদের সম্মানী গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখিত তারিখের মধ্যে সম্মানী গ্রহণ না করলে উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে।

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

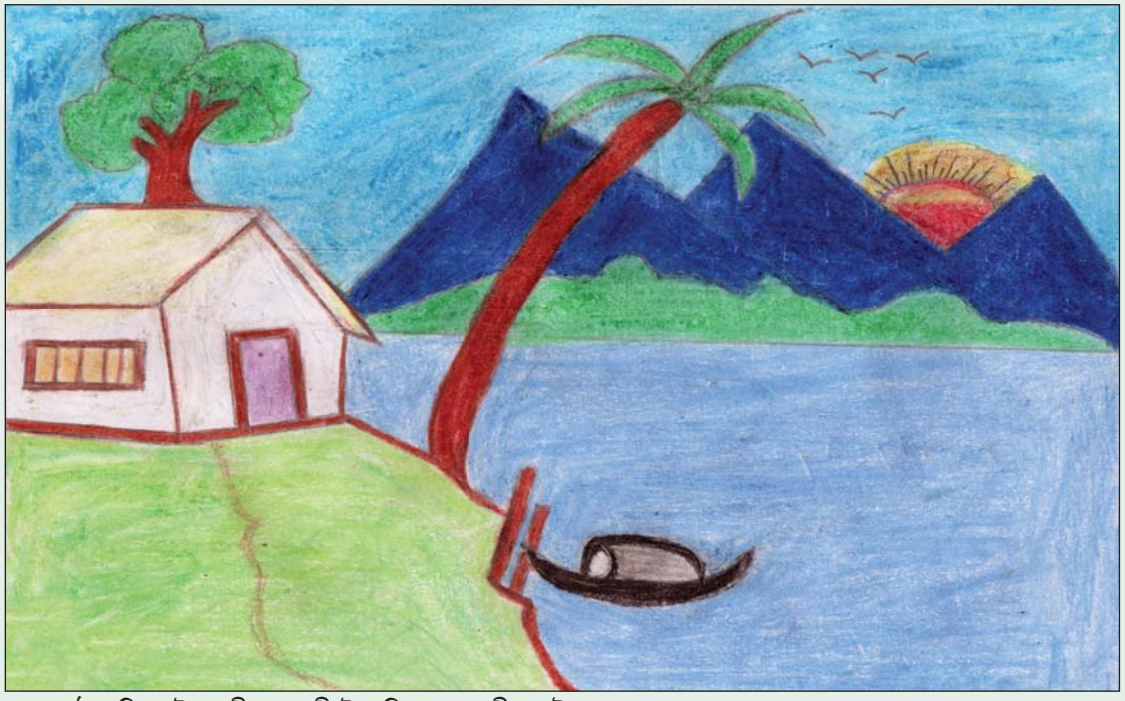

শান্ত, ষষ্ঠ শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

রহমাতুল আলম, দ্বিতীয় শ্রেণি, গণভবন সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা

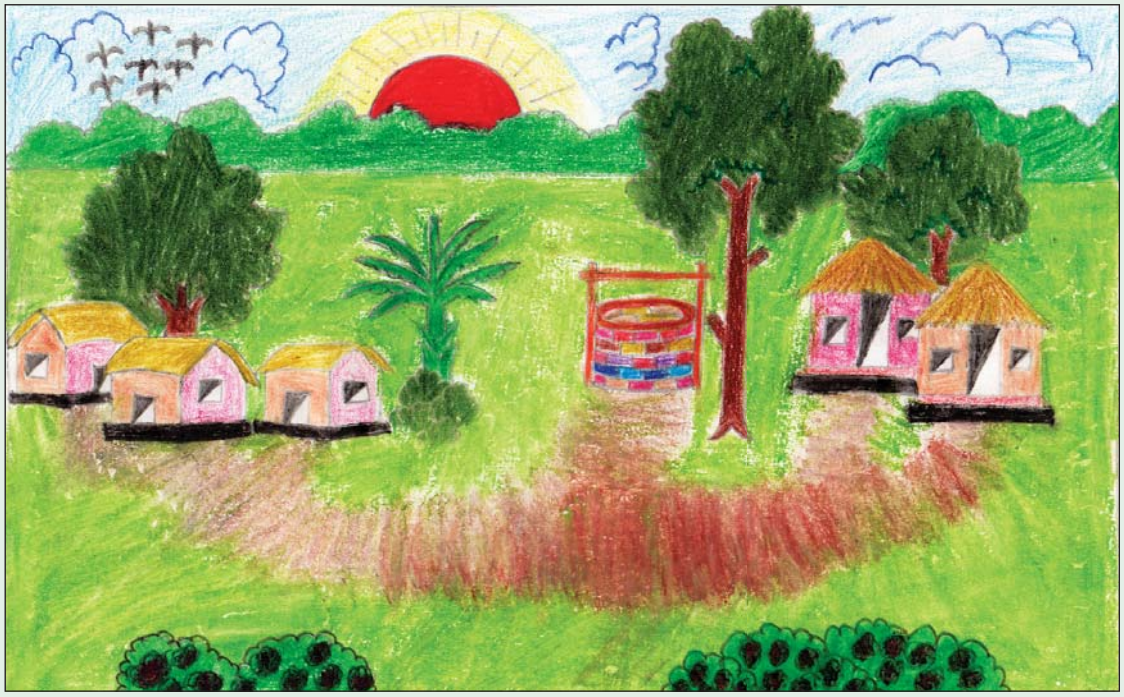

মৌমিতা আক্তার বন্যা, পঞ্চম শ্রেণি, নতুন কুঁড়ি কিন্ডার গার্টেন, শেরপুর

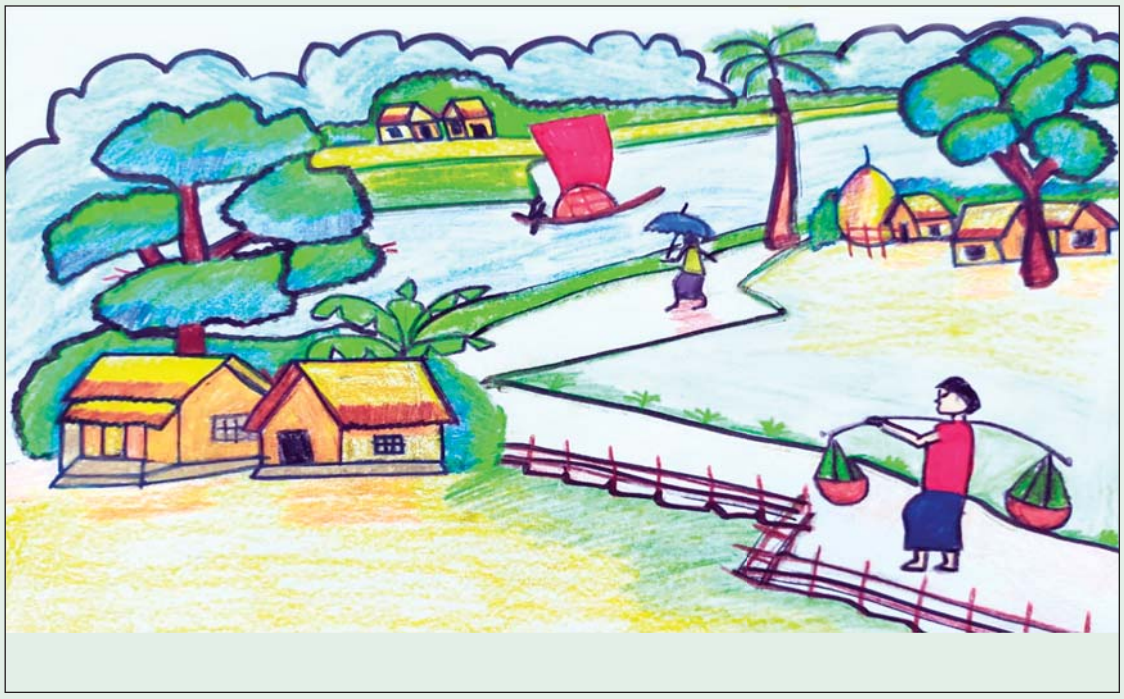

আয়ান হক ভূঁইয়া, তৃতীয় শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

উম্মে মেহজাবিন রাইশা, চতুর্থ শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-48, No-02. August 2023, Tk-20.00

Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা